শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

প্রকাশক
শ্রীকানাইলাল সরকার
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু
প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহন বাগান লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
অহি মালিক

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

ব্লক মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের :

একটি রঙ-করা মুখ

এ জন্মের ইতিহাস

শ্বেত কপোত

সমুদ্রের গান

সিন্ধুর টিপ

দেবকন্যা

নীল সিন্ধু

এক আশ্চর্য মেয়ে

সীমা স্বর্গ

জলকন্যার মন

জনপদবধূ

নীলাঞ্জনছায়া

বিদিশার নিশা

—বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বললে যেমন শোনায়, ঠিক তেমনি কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাইলট মুখার্জি। শুধু শুনতে পাওয়া নয়, স্পষ্ট যেন দেখতেও পেলেন খুকীকে। খুকীর মায়ের ইচ্ছা নয়, তবু প্রবল জেদ ধ'রে অনেক কান্নাকাটি করে রামস্বামী-বেয়ারাকে দিয়ে দোকান থেকে সে কিনে আনিয়েছিল একটা সাদা শাড়ি। সেবার মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় টাউন-হলে বুঝি হচ্ছিল সরস্বতী-পুজো। সেই উপলক্ষ্যে নিজে-নিজেই বাসন্তী-রঙে ছুপিয়েছিল সেই শাড়িখানা। কিন্তু শাড়ি-পরা কি ওর অভ্যাস আছে? না, দশ বছরের কচি মেয়ে ওই শাড়ি সামলাতে পারে? সারাটা সকাল টাউন-হল কিংবা বান্ধবীদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করে এসেছে। একসময় আঁচলটা এক হাতে সামলাতে সামলাতে ছুটে এল ওঁর কাছে, দুটি হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে কী মনে করে যেন চুপি চুপি কানে কানে বলে উঠ্‌ল, বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

সেদিনটা ছুটি ছিল মুখার্জির। একা-একা ঘরে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। চমকে উঠে, তারপরে মুখ তুলে একটু হেসে মেয়েকে এক হাতে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, কেন মা, 'মিলি' নামটা তোমার পছন্দ নয়?

—ছাই!

হেসেছিলেন। কিন্তু সত্যিই 'মিলি' আর 'বাসন্তী' হয় নি। অথবা অন্তরে ছিল যার 'বাসন্তী' হবার একান্ত বাসনা; তার মায়ের অদম্য প্রয়াসেও সে খাটো-চুল আর রঙানো-ঠোঁটের 'মিলি'

হতে পারল না। সে 'ছাই' হয়ে গেল। ওয়াল্টেয়ার স্টেশনের পরপারে পশ্চিম কোণে সিং-দরজা-দেওয়া পাথরের-পর-পাথর-দিয়ে-গাঁথা যে শ্মশান-চত্বরটি রয়েছে, তার এক পাশে সে আর তার স্মৃতি ছাই হয়ে মিলিয়ে আছে আজ সাত বছর।

সাত বছর। বেঁচে থাকলে সতেরো বছরেরটি হতো আজ। সেদিনকার আট বছরের গৌতমই তো আজ পনরো বছরের। সেণ্ট্ অ্যালইসাস্ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে।

আশ্চর্য! সাত-সাতটি বছর কেটে গেছে খুকী চলে যাবার পর।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন মুখার্জি। পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে তাঁর গায়ে। পাশের খাটে শূন্য বিছানার পায়ের কাছে লাল মখমলের দামী কম্বলটা পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা।

ঠক্ ঠক্ করে কোথায় কাছেই কে যেন কাঠের ওপর পেরেক ঠুকছে। একটা নয়, দুটো নয়—একের পর এক—অনেকগুলো পেরেক।

নরম কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে উঠে বসতেও ইচ্ছা করছে না। বহুদিন পরে খুকীর কথা মনে পড়ল। বহুদিন পরে স্বপ্ন দেখলেন খুকীকে। একেবারে ভোরের স্বপ্ন।

সে চলে যাবার পর দু-তিন মাস পর্যন্ত বার কয়েক তার কথা হয়তো উঠেছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। গৌতম ছিল একেবারে নির্বাক, তার দিদির কথা অন্তত ওঁকে একবারও জিজ্ঞাসা করে নি। তার মায়ের কাছে করেছিল কি না, কিংবা আজও করে কি না, জানা নেই।

জানা নেই অনেক কিছু। খুকীকে স্মরণ ক'রে আজও নীলিমা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে কি না, জানা নেই। নিজের মনটাকেই কি ভাল করে তাঁর জানা আছে? কত আদরের ছিল খুকী, কিন্তু সে যাবার পর কতগুলি দিন তিনি স্মরণ করেছেন ওকে? দিনের পর দিন গেছে, রাত এসেছে, রাত গেছে, নিজের কাজ আর

নিজের চিন্তা নিয়েই কেটে গেছে সমস্তক্ষণ। কোন্ ঘরের কোন্ দেয়ালে যে ফ্রক-পরা ছোট্ট একটি মেয়ের ছবি দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে চলেছে, কে জানে!

অথবা, সে ছবি আজও আছে কি? এই সাত বছরের মধ্যে একদিনও কি রামস্বামীর অসতর্ক হাত লেগে মেঝেতে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি তার কাচগুলো? কে জানে! হয়তো গেছে, হয়তো যায় নি।

খুকীর মায়ের নাম নীলিমা। কিন্তু শাশুড়ীর আদরের ডাকটিই সর্বত্র চলন হয়ে গিয়েছিল—নেলী।

শুধু আদরের ডাকই নয়, তাঁর রুচি তাঁর চিন্তা সমস্তই যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁর কন্যাকে। কিন্তু, কন্যার মধ্যে ছিল অদ্ভুত অনমনীয়তা। নেলী বলত, কী অবস্টিনেট! আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই মাথাটি খাচ্ছ!

হেসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বলতেন, খাচ্ছি নাকি মা?

দশ বছরের কচি মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাত তাঁর দিকে, বলত, না বাবা।

হো-হো করে হেসে উঠতেন মুখার্জি। নেলী রাগ করে চলে যেত ঘর থেকে, বলত, সিলি।

কন্যা বলত, বাবা!

—কী মা?

দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলত, কলকাতায় জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে তোমার মার যে ছবিখানা আছে, ওটা এখানে দেখি নি। খুব সুন্দর ছিলেন, না বাবা? ওই ছবির মতো? আমি ওই রকম করে কাপড় পরব। আমি ওই রকম লম্বা চুল রাখব। শাড়ি পরব। ওই রকম চুলের গোছা নামিয়ে দেব কাঁধের ওপর দিয়ে। তুমি আমার ওই রকম একটা ছবি তুলবে তো বাবা?

কত রকম কত কী যে কথা বলত খুকী। অজস্র কথা। ওর ভাল লাগত, তা-ই ও হতে চাইত। কিন্তু আজ তা

ভাবতে গেলে, ওর ওই সব-কিছু চাওয়ার মধ্যে একটা অপূর্ব সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। এক কথায়, ওইটুকু মেয়ে হতে চাইত ওর মা আর দিদিমার ঠিক বিপরীত।

আশ্চর্য! খুকীর কথা আজ অত মনে পড়ছে কেন হঠাৎ?

নেলী বলেছিল, নিউমোনিয়ার তো কত ভাল চিকিৎসা হয়েছে। এখানে চিকিৎসারও ত কোনও ত্রুটি হয় নি। তবু মিলি চলে গেল কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর কে দেবে? ওর মায়ের গেছে মিলি, আর ওর বাবার গেছে বাসন্তী।

—বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

নাঃ, উঠে পড়তে হচ্ছে এইবার। এখনও চা দিয়ে গেল না কেন? পেরেকের ঠুক্‌ঠুক্‌ এখনও চলেছে। প্যাকিং বাক্সগুলি পেরেক ঠুকে বন্ধ করছে বেয়ারারা। কিন্তু, যাওয়ার পালা তো কাল। আজ থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করল কেন নেলী?

আজ শেষ অফিস-যাওয়া। শেষ তো সবই হয়ে গেছে কাল। অর্থাৎ আজকের ব্যাপারটা গতকালই শেষ করে রাখা হয়েছে। লেখালেখি—এখানে সই ওখানে সই—চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া—পোর্ট কনজারভেটর নিজেই বুঝে নিয়েছেন সব—গ্রাচুইটির ফর্মে সই—তার বন্দোবস্ত—প্রভিডেণ্ট ফণ্ড—বলতে গেলে কাল সারা অফিস তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সমস্তটা দিন।

—পেনশন নিলেন না কেন?

—না, অপশন যখন পেয়েছি, তখন এককালীন টাকাটাই চাই। প্রচুর উপকারে আসবে।

সহকর্মী পাইলট ওয়াদলকার হেসে বললেন, উনি যে বাড়ি করছেন কলকাতায়। বিরাট বাড়ি। জাহাজী প্যাটার্নের। আমি প্ল্যান দেখেছি।

—সত্যি ?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখার্জি বলেছিলেন, না না, বিরাট নয়। কুঁড়েঘর। জাহাজী প্যাটার্ন নয়। টাগ বলতে পার, আমাদের টাগ মেঘাদ্রি।

কনজারভেটর ক্যাপ্টেন রড্‌রিগ্‌ শুনছিলেন সমস্ত কথা মন দিয়ে। হেসে উঠলেন মেঘাদ্রির কথায়।

সস্নেহে বললেন, ছ্যাট্‌ লিট্‌ল বেবী মেঘাদ্রি। যাচ্ছ যাও, অন্তত ওকে তুমি ভুলতে পারবে না মুখার্জি। ওর সেই শেকল-ছেঁড়ার গল্পটা মনে পড়ে ?

হেসে উঠলেন সবাই। জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে, তখন দু পাশ দিয়ে দুটি মোটা লোহার তার নিজের নিজের শিকলে বেঁধে দু পাশ দিয়ে ধ'রে জাহাজটাকে টেনে নিয়ে যায় দুটি টাগ। মোটর বোটেরই বৃহত্তর সংস্করণ। আরও শক্ত—আরও মজবুত। ইঞ্জিনঘরটা কেবিন দিয়ে ঢাকা, তার ওপরে দোতলায় সারেঙের ঘর—অর্থাৎ হুইল হাউস। তার ঠিক পাশ ঘেঁষে মাথায় কালো ডোরা দেওয়া হলদে রঙের মোটা চিমনিটা ধূমোদ্‌গীরণ করছে। এরই একটির নাম—মেঘাদ্রি। একবার বুঝি কোন্ জাহাজটা টানতে গিয়ে শেকলটাই ছিঁড়ে ফেলেছিল। প্রায়ই মেরামতি লেগে আছে ওর। আজ এটা ভাঙছে, কাল ওটা ভাঙছে। বহুদিনের পুরনো। যেন চিরকালের দুষ্টু মেয়ে, খেলা করতে গিয়ে আজ হাত কেটে আসছে, কাল পা কেটে আসছে, মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে। ওকে নিয়ে পাইলটদের মধ্যে কৌতুকের আর অন্ত ছিল না, যত কৌতূক তত স্নেহ।

কে যেন তুলেছিল ফেয়ারওয়েলের কথাটা। প্রতিবাদ করেছিলেন মুখার্জি। ওসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আদৌ পছন্দ করেন না তিনি। ওসবের দরকার নেই।

—অফিসের সবার হাসিমুখই আমার ফেয়ার-ওয়েল।

—দাঁড়াও।

ক্যাপ্টেন রড্রিগ্ তাঁর খাকী শার্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট্‌বই বার করে তার কয়েকটা পাতা উলটে এক জায়গায় থামলেন, তারপর ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে বলে উঠলেন, ব্যাড মেমারি। তাই সব টুকে রাখি। শোন। "There cannot be any farewell to thee, my mind is coloured by thy every huc !"···এটা আমারও কথা।

—অজস্র ধন্যবাদ রডরিগ্।

—না। এ-কথা আজকে বলছি না। বলব কাল। কাল তুমি তোমার শেষ জাহাজ পাইলট করে আনবে—"স্টিল ম্যারিনার।" আজ আমি ওটা রিহার্স্যাল দিয়ে রাখলাম।

—রিহার্স্যাল! হো-হো করে হেসে উঠলেন ওয়াদলকার।

মুখার্জি বলেছিলেন, কিন্তু ভারি সুন্দর কোটেশন। কোথায় পড়েছিলে?

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন রড্রিগ্, কেমন যেন স্বপ্নিল দুটি চোখ, বললেন, কাব্য পড়ার সময় কই? ব্যাঙ্ক লাইনের একটা জাহাজ। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তার ক্যাপ্টেন। আহা, দেশের হাসপাতালে থ্রম্বসিসে সেদিন শুনলাম মারা গেছে। তার মুখে শুনেছিলাম। টুকে রেখেছিলাম নোট্‌বুকে। এই নোট্‌বুক নয়, সে আর-একটা, বাড়িতে আছে। যেখানে যা কিছু ভাল শুনতাম, টুকে রাখতাম, মুখস্থ করতাম। আজ আর মুখস্থ থাকে না, তাই অন্তত কিছু বাছা বাছা মনের মতো কথা এই ক্ষুদে নোট্‌বইটাতে আবার টুকে রাখছি। কেউ কাছে না থাকলে লুকিয়ে লুকিয়ে বার করি, আর মনে মনে আওড়াই।

ওয়াদলকার বললেন, নোট্‌বুক আমারও আছে ক্যাপ্টেন। তবে আমি তাতে জাহাজের নাম লিখে রাখি। যতগুলি জাহাজ আমি এ যাবৎ পাইলট করে এনেছি, সেই সব নাম। তা প্রায় শ-দুয়েক হবে।

—এক জাহাজ চারবার পাঁচবার এনেছ তো?

—হ্যাঁ, তার চেয়ে বেশীও হবে। সব ধরেই দুশো।

রড্রিগ্ সস্নেহে বললেন, ইয়ংম্যান্, আমাদের বহু দুশো পেরিয়ে গেছে। কী বল মুখার্জি?

—হ্যাঁ, তা হবে।

রড্রিগ্ বললেন, আমরা সমবয়সী। অথচ সহপাঠী নই। মুখার্জি বোম্বে থেকে লণ্ডন, আর লণ্ডন থেকে গ্লাস্গো। আর, আমি এবার্ডিন থেকে গ্লাসগো, আর গ্লাসগো থেকে লণ্ডন। বিলেতে আমাদের কখনও দেখা হয় নি। দেখা হল এদেশে এসে। তাও লেট্ লাইফে। এই ভাইজাগ পোর্টে। আমি পোর্ট কনজারভেটর হয়ে পাঁচ বছরের এক্সটেনশন পেলাম। মুখার্জিও এক্সটেনশন পেয়েছিল, কিন্তু নিল না। আমার মাথায় প্রকাণ্ড টাক, টুপি দিয়ে ঢেকে রাখি। মুখার্জির মাথাভর্তি চুল, কিন্তু সব সাদা। রাদার আন্টাইম্লি। কী বলো? পঞ্চান্ন বছরে মাথার সব চুল পেকে যায়, এ আমি কখনও দেখি নি।

ওয়াদলকার বললে, আমি দিল্লীতে কিন্তু একজনকে দেখেছিলাম। তার বোধ হয় পঞ্চান্নও হয় নি।

নিজের চিন্তায় নিজেই মগ্ন হয়ে আছেন, এর মধ্যে সাদা-উর্দি-পরা রামস্বামী যেন কখন ঘরে ঢুকেছে চা নিয়ে। টিপয়টা বিছানার কাছে টেনে এনে চায়ের ট্রে-টা তার ওপরে সন্তর্পণে রাখল, বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েও রইল চুপচাপ। প্রতিদিনের অভ্যাস্-মত একবার নিম্নকণ্ঠে সসম্ভ্রমে 'সাব' বলে ডেকেও ছিল কি?

ফোন্টা কি বেজে উঠল এই সময়? রামস্বামী যেন ছুটে গেল ফোনটার দিকে। রিসিভারটা উঠিয়ে কানের কাছে ধ'রে কী যেন শুনল, কী যেন বললও। তারপরে রিসিভারটা নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে ছুটে এলো তাঁর কাছে। এবার কণ্ঠে একটু জোর এনেই সে ডেকে উঠল, সাব!

—উঁ ?

—টেলিফোন।

পরিপূর্ণ চোখ মেললেন এবার মুখার্জি, বললেন, কোন্ ?

—অফিস।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন মুখার্জি। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিলেন রিসিভারটা। সাড়াও দিলেন। তাঁরই কেরানী-বাবুর কণ্ঠস্বর। 'তাঁর কেরানী'—কথাটা মনে হতেই হাসি এলো ঠোঁটের কোণে। আজই শেষ। তারপরে কে কার!

—স্যর, স্টিল ম্যারিনার এসে গেছে, লাইট্ হাউসের অবজারভেশন পোস্ট থেকে সিগন্যালাররা রিপোর্ট দিচ্ছে,—'জি ফ্ল্যাগ ইজ্ আপ্।'

যথারীতি উত্তর দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন মুখার্জি।

রামস্বামী ততক্ষণে কাপে লিকর ঢেলে পরিমান-মত চিনি আর দুধ দিয়ে এক কাপ চা তৈরি করেছে।

—চিনি কম দিয়েছিস তো ?

এ ধরনের কথা বুঝবার মত দুটো-তিনটে বাংলা কথা রামস্বামী শিখে ফেলেছে। বললে, জী হাঁ।

কত লোকের বাড়িতেই না কাজ করেছে এই রামস্বামী! ইংরেজীও বলতে-বুঝতে শিখেছে। একটু আধটু হিন্দীও। বাংলাও কিছু কিছু। এর পর মারাঠী কি গুজরাতী, কী শিখবে কে জানে? কে আসবে তার শূন্য কোয়ার্টারে? পরবর্তী পাইলট। কিন্তু, কে হবে সে? বাঙালী? না, মারাঠী? না, গুজরাতী? বোম্বে থেকে লোক পাঠাবে শোনা গেল। তা আসতে-আসতেও মাসখানেক অন্তত। এই একটি মাস মাত্র দুজন পাইলটে পোর্ট চালাতে হবে—মারাঠী ওয়াদলকর আর গোয়ানিজ ডি-সুজা। কিংবা 'পি-সি' বা কনজারভেটর (মুখে 'পি-সি' বললেও, আসলে পদবীতে কিন্তু 'ডি-পি-সি'—ডেপুটি পোর্ট কনজারভেটর) নিজেই পাইলটিং করবেন এই এক মাস ?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পুবের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জি। রামস্বামী বোধ হয় ওঁর মনের ভাব বুঝেই জানলাটা পুরো খুলে দিয়ে পর্দাটা ভাল করে সরিয়ে দিয়েছে।

ওই তো দেখা যাচ্ছে। নোঙর ফেলার আয়োজনে ব্যস্ত 'স্টিল ম্যারিনার'। সামনের মাস্তুল থেকে মিড সিপের ধ্বজদণ্ড পর্যন্ত যে তার ঝুলে থাকে ফ্ল্যাগ-সিগন্যালিংয়ের জন্য—তাতে সত্যিই 'জি' ফ্ল্যাগ ঝুলছে। কালো চৌকো একটা কাপড়ের মধ্যেকার চৌকো একটা স্থান একেবারে সাদা।

মালবাহী এই আমেরিকান জাহাজগুলি খুব সুন্দর। ইস্থ্-মিয়ান লাইনের এই আধুনিক টাইপের জাহাজগুলি দশ হাজার টন মাল নিতে পারে, আবার জন বারো প্যাসেঞ্জারও নিতে পারে। কে যেন কাল বলছিল অফিসে, জাহাজ আসছে বিলেত ঘুরে। চারজন প্যাসেঞ্জারও বুঝি আছে, এখানেই নামবে তারা।

তা তারা নামুক, কোনও কৌতূহলই নেই তাঁর। কিন্তু এ জাহাজের ক্যাপ্টেন কে? তাঁর কি চেনা? ইস্থ্‌মিয়ানের বহু জাহাজ তিনি পাইলট করে বন্দরে এনেছেন, কিন্তু 'স্টিল ম্যারিনার' তাঁর কাছে নূতন। অবশ্য, ক্যাপ্টেন ওদের প্রায়ই বদলে যায়। সেই যাকে 'স্টিল নেভিগেটরে' একদিন দেখলেন, তাকে পরবর্তী কালে হয়তো দেখা গেল 'স্টিল ফ্যাব্রিকেটরে'। কে জানে, হয়তো 'স্টিল ম্যারিনারে' গিয়ে তিনি দেখবেন, 'ফ্যাব্রিকেটরে'র সেই বুড়ো ক্যাপ্টেন ব্যারি হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করছে, হ্যালো মুকি!

মুখার্জিকে পালটে নিয়ে বহু ক্যাপ্টেন-বন্ধুই তাকে 'মুকি' বলে ডাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

চা খেয়ে, বাথরুম ঘুরে এসে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পরা শেষ করে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

—দূরবীন দেব নাকি?

নেলী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। পাড়-বিহীন সাদা একটা

জর্জেট শাড়ি পরনে, সাদা সাটিনের ব্লাউজ, মাথার বব-করা অস্নাত চুল রুক্ষ আর এলোমেলো হয়ে আছে।

মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালেন মুখার্জি। পঁয়তাল্লিশ বোধহয় ছাড়িয়েছে ওর বয়স, তবু কেমন যত্ন এখনও স্বাস্থ্যের প্রতি। তেমন মোটা হয় নি নেলী, মাথার চুলেও তেমন পাক ধরে নি, পোশাকে-আশাকে এখনও ছিমছাম।

ওর দিকে তাকিয়ে মন প্রসন্নই হয়ে উঠল। বললেন, দাও। দূরবীনটা তো কাজের জন্যই কেনা হয়েছিল। কাল থেকে ওরও কাজ শেষ, হয়তো বাক্সে গিয়ে চিরতরে বন্দী হবে। আজ ওকে শেষবারের মতো হাতে নেওয়া যাক।

শেষবারের জন্য তো বটেই। আর তিনি কখনও পাইলটিং করবেন না। চাকরিতে এক্সটেনশন পেয়েও যখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না, নীলিমা তা ভাল মনে নিতে পারেন নি। আরও পাঁচ বছর চাকরি করলে কী ক্ষতিটা হত? মুখার্জি কোনদিন স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করেন নি, এবারেও হয়তো করতেন না। কিন্তু ডাক্তারের অভিমত ছিল অন্যরূপ। ওঁর ব্লাডপ্রেসার বেশ বেশী, এ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম আর-কতটা ওঁর পক্ষে সহনীয় হবে সেটা ভাববার বিষয়। এই যুক্তিতে নীলিমার হার হয়েছিল। বলেছিলেন, না, আর চাকরি তোমাকে করতে দেব না।

জানলার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দূরবীনটা ঠিক-ঠাক ক'রে নিয়ে চোখের কাছে ধরলেন। পিছন থেকে নেলীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছেঃ ওই তোমার শেষ জাহাজ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কী নাম?

বললেন।

নেলীর আর-কোনও প্রশ্ন নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জাহাজের ভিতরটা। পিছনের দিকে কালিঝুলি-মাখা খালি-গা একদল

খালাসী উইন্‌চ ঘুরিয়ে ঘর্ঘর করে নোঙর ফেলতে ব্যস্ত। ওপরে জাহাজের ব্রীজে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে।

মুখার্জি জাহাজে গিয়ে পৌঁছলে আবার নোঙর উঠবে।

দূরবীনটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন মুখার্জি। নেলী বললেন, সমুদ্র কিন্তু আজ খুব শান্ত।

হেসে বললেন, কবে না শান্ত থাকে ?

—ওরে বাবা!—নেলী যেন কিছু চিন্তা ক'রে নিজের মনেই শিউরে উঠলেন—মন্‌সুনের কথা ভাবো তো? কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ! আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আর ভয়ে মরছি। তোমার বোট যত এগোয়, আমার তত ভয় হয়—এই বুঝি ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে উলটে যায়!

হেসে উঠলেন মুখার্জি। নেলীর এই আকুলতাটুকু আজ কিন্তু ভালও লাগল। ওর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, কলকাতায় গিয়ে তোমাকে নিয়ে খুব ঘুরব। আজ এখানে, কাল সেখানে, একেবারে আশ মিটিয়ে।

—যাও।

যেন বহু বছর আগেকার নেলীর মতই মুখ ঘুরিয়ে একটু সরে দাঁড়াল নেলী। তারপরে একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে, মনে আছে তো?

—কী?

—আজ সন্ধ্যায় ক্লাবে তোমার জন্য ফেয়ারওয়েল পার্টি!

মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল মুখার্জির মুখঃ এসব আমি চাই না, তা তো জান। অফিসে পর্যন্ত এড়িয়ে গেলাম।

—বাঃ রে, ওদের কার্ড পর্যন্ত বিলি হয়ে গেছে!

—আচ্ছা, কেন এ সব বলতো! আমি তো বারণ ক'রে দিয়েছিলাম।

—কিন্তু বারণ করবেই বা তুমি কেন? তুমি তো একাই ফেয়ার-ওয়েল পাচ্ছ না, আমিও পাচ্ছি। আমি রাজী হয়েছি। কথাও দিয়েছি।

সেই বহু বছর আগেকার নেলীর মতই দৃপ্ত ভঙ্গীতে কথাটি বলে ঘর থেকে ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গেল নেলী।

প্রতিবাদ করা বৃথা। তাই আর কোনও কথা বললেন না মুখার্জি, মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে দৃক্‌পাত করলেন শুধু।

দেখতে দেখতে তাঁর নিজের ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। খুবই ছেলেবেলাকার কথা। বাবা তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নোয়াখালিতে বদলী হয়ে গেছেন। বাবার সঙ্গে সেই গোয়ালন্দ হয়ে চাঁদপুর। সেখান থেকে ট্রেনে লাকসাম হয়ে তারপর নোয়াখালি।

চাঁদপুরের সেই দিগন্তবিস্তৃত বিপুল জলরাশি সেই বয়সে মনে একটা অদ্ভুত ছাপ এঁকে দিয়েছিল। জল আর জল। এপার-ওপার দেখা যায় না। শুধু দিগন্তে একটা কালো সরলরেখা। সেটা তীরের রেখা, না এই সমুদ্রের মতই জলের রেখা, তা আজ মনে করা অবশ্য যায় না। কিন্তু এই রকম জানলায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাতে তাকাতে কতদিন এই আজকের মত সেই চাঁদপুরের ছবিই স্মৃতির দিগন্তে ভেসে ভেসে উঠেছে।

—গাড়ি তৈরী।

চমকে উঠলেন যেন মুখার্জি, তারপর বললেন, যাই।

নীলিমা বললে, ও কী! ব্রেকফাস্ট খেলে না?

—খেয়েছি।

—কিন্তু সবই যে পড়ে আছে!

—থাক্।

আর-কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পথ ধরলেন মুখার্জি। গ্যারেজের দরজাটা খুলে ক্লিনার মক্‌বুল দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে।

দরজা খুলে উঠে বসলেন পুরনো হিলম্যান গাড়িটাতে। নিজেই ড্রাইভ করবেন। এটিও বহুদিনের সঙ্গী। বহু লোক এটি বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু না, এটা তিনি ছাড়বেন

না। রেলওয়ে-বুকিংয়ে এটিও যাবে কলকাতা। তাঁদের সঙ্গে যাবে না, হয়তো দেরি হবে কিছু। গোয়ানীজ ডি'সুজা এই ভারটা স্বেচ্ছায় নিয়েছে নিজে। বীচ রোডের নির্জন রাস্তা ধ'রে হু-হু করে ছুটে চলল তাঁর বিশ্বস্ত হিলম্যান।

একেবারে পাইলট-জেটি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সমুদ্রের জল ভিতরে ঢুকে এসে একটু দূরেই বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁক থেকে জলধারা কিছু এগিয়ে তিনটি শাখায় গেছে ভাগ হয়ে। এর একটি শাখায় জাহাজ বাঁধার পাকা জেটি। মাত্র তিনটি জাহাজ বাঁধা যেতে পারে একত্রে। বাকী জাহাজ এলে থাকে ভাসমান বয়া অথবা কয়লা-জেটির গায়ে বাঁধা। কলকাতা বা বম্বের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র বন্দর।

—সেলাম সাব।

—সেলাম। সব ঠিক হৈ রামলু?

—জী হাঁ।

গাড়িটা অফিসের গ্যারেজে রেখে একটু হেটে এসেই কাঠের ছোট্ট জেটি পেরিয়ে বোটে উঠলেন মুখার্জি। সঙ্গে সঙ্গে ক্রি-রি শব্দ। তারপরে বোট একটু পিছিয়ে এসে, তারপরে মুখ সোজা এগিয়ে চলল বহিঃসমুদ্রের দিকে।

ধবধবে সাদা রঙ বোটটার। ইঞ্জিন-রুমের গায়ে রঙ করে লেখা : পাইলট। রুমের ওপরে রামলু-সারেঙের হুইল ঘোরাবার জায়গা।

রুমের সামনে কাঠের পাটাতনের ওপর চেয়ার পাতা থাকে, তার ওপরে বসে পড়লেন মুখার্জি। বোট যত অগ্রসর হতে লাগল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে লাগলেন তিনি, সেইমত চলতে লাগল বোট।

নীল-উর্দি-পরা একজন খালাসী দাঁড়িয়ে আছে বোটের গলুয়ের কাছে। আর তাঁর ঠিক পাশে আর-একজন খালাসী কাঁধে ব্যাগ

ঝুলিয়ে। লোকটির নাম পোলায়া, ওর ব্যাগে দরকারী সব কাগজ-পত্র। লোকটি তাঁরই সঙ্গে এখন উঠবে জাহাজে।

সবাই ওরা চুপচাপ। নিশ্চয়ই ওরা জেনেছে, চলে যাচ্ছেন মুখার্জি। এই-ই তাঁর শেষ জাহাজ। তবু ওদের মুখে কথা নেই। কী এক অব্যক্ত বেদনায় যেন থমথম করছে ওদের মুখ।

ডেকে ওদের কিছু বলবেন নাকি এ বিষয়ে? বলবেন নাকি মুখ ফুটে, আমি কালই চলে যাচ্ছি, জানিস?

কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কথাটা বলতে পারলেন না তিনি। আর কীই বা বলবেন? তার থেকে কাজ করতে করতে এমন করে হঠাৎ মুছে যাওয়াই ভাল।

বড় শান্ত আজ সমুদ্র। নিস্তরঙ্গ জলস্রোতের ওপর দিয়ে তরতর করে হাঁসের মতো এগিয়ে যেতে লাগল বোট।

বন্দরের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজ। পাশ দিয়ে দিয়ে হালের কাছ পর্যন্ত চলে গেল বোট, তারপরে মুখ ফিরিয়ে একেবারে কাছ ঘেঁষে চলতে লাগল গতি মন্থর করে।

—কোন্ দিকে সিঁড়ি দিয়েছে রে, রামলু?

—স্টারবোর্ড।

—তা হলে ঠিক আছে। সিঁড়ির কাছে নিয়ে যা। পোলায়া, সিঁড়ি ধরিস।

জাহাজের সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকটা হয় পোর্টসাইড, ডান দিকটা স্টারবোর্ড। আর পাইলট ওঠবার জন্য যে-সিঁড়িটা ঝুলিয়ে দেয়, সেটা দড়ির। তুটো দড়ি পাশাপাশি ঝোলানো—মাঝখানে শক্ত করে সিঁড়ির মত পর পর কাঠ লাগানো। তুহাতে দড়ি ধরে দোতুল্যমান সিঁড়ি দিয়ে কাষ্ঠখণ্ড-গুলির ওপর পা রেখে রেখে ওপরে ওঠা। নতুন লোকের ভয় করবে, কিন্তু এঁদের এটা অভ্যাস।

উঠতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো চীফ অফিসার, বললে, মর্নিং পাইলট্।

—মর্নিং।

তরতর করে লোহার সিঁড়ি বেয়ে এবার ওপরে উঠলেন মুখার্জি, একেবারে তেতলায়, ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনেকার বারান্দায়, অর্থাৎ 'ব্রীজে'।

না, এ ক্যাপ্টেন তাঁর পরিচিত নয়। নাম বললে, উইলিয়াম্‌স্‌। মধ্যবয়সী, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা। মুখার্জির সঙ্গে এক জায়গায় অদ্ভুত মিল—মাথার চুলগুলি ওরও ঘন আর বড় বড়, কিন্তু সব সাদা।

প্রাথমিক সম্ভাষণ শেষ করে কাজে লাগতে না লাগতেই দেখা গেল, লম্বা ত্রিকোণ নিশানের মত লাল একটা ফ্ল্যাগ উড়ছে, মাঝখানে সাদা লম্বা দাগ। পাইলট-ফ্ল্যাগ। তার মানে, যারা জানবার তারা জেনে রাখ—পাইলট জাহাজে উঠেছেন।

ওঁকে রেখে বোট ফিরে যাচ্ছে, আর বন্দরের মুখে দেখা যাচ্ছে, টাগ দুটোর চিমনির ধোঁয়া, মেঘাদ্রিরা এসে পড়ল বলে।

ঘড়্‌ ঘড়্‌—ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দে জাহাজের নোঙর উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টাগ এসে লাগল। শুরু হল কর্মব্যস্ততা। তাঁর নির্দেশমত মুখে চোঙা লাগিয়ে উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন নিজেই চালিত করতে লাগলেন খালাসীদের।

এখান থেকে বন্দরে গিয়ে জাহাজ বাঁধা-পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত, ক্যাপ্টেনের কোনও দায়িত্ব নেই, সব দায়িত্ব পাইলটের। তাঁরই হাতে এখন জাহাজ-চালানোর সর্বময় কর্তৃত্ব।

জাহাজ যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে, টাগ দুটো যেন এক নবাগত পথিকের হাত ধ'রে সমাদরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বন্দর-অভ্যন্তরে।

পিছন ফিরে তটরেখার দিকে একবার তাকালেন মুখার্জি। শহরের ঘন বসতি ছাড়িয়ে বেলাভূমি ধরে উত্তরে গিয়ে জনবিরল একটা দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বাসা কয়েকটা ঝাউগাছের অন্তরালে। একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে তাঁর ঘরের সেই

জানালাটিও দেখা যায়। লোক ঠিক চেনা যায় না, তবু কি মনে হয় নীলিমা দাঁড়িয়ে আছে ওই জানালার পাশে চুপচাপ? কে জানে!

কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন মুখার্জি। বলে উঠলেন, শ্ল্যাক ডাউন স্টারবোর্ড। অর্থাৎ, ডাইনের টাগ, জাহাজের সঙ্গে বাঁধা তোমার লোহার টানা তারটা একটু ঢিলে করো।

ক্যাপ্টেন অমনি তাঁর হাতের চোঙাটায় মুখ রেখে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, শ্ল্যাক্ ডাউন স্টারবোর্ড।

কিছুক্ষণ পরে আবার অনুরূপ নির্দেশ, পুল্ অন্ স্টারবোর্ড।

চোঙায় জলদ্গম্ভীর স্বর তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল, পুল্ অন্ স্টারবোর্ড। অর্থাৎ, আবার টান হে ডান দিকের টাগ।

এমনি করতে করতে ক্রমশ বন্দরের মুখ ছাড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করল জাহাজ।

কাজ করতে করতে একসময়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, সাদা-শাড়ি-পরা কে একটি মেয়ে বাঁ দিককার দোতলায় রেলিং ধরে লাইফ বোটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

শাড়ি-পরা মেয়ে কে এলো এই জাহাজে? মুখখানা পাশ ফেরানো, ভাল ক'রে দেখা যায় না, তবু মনে হল, অল্পবয়সী মেয়ে। অচেনা ক্যাপ্টেনকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাও অশোভন। আর তা ছাড়া, কে মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, কোথা থেকে আসছে, তাঁরই বা অতশত জানবার প্রয়োজন কী?

শুধু বললেন, ক্যাপ্টেন, তোমার জাহাজে কিছু প্যাসেঞ্জার আছে মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, চারজন। তার মধ্যে একজন লেডি। সবাই আসছে বিলেত থেকে।

—বিলেত!—অকারণে হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন মুখার্জি। পরক্ষণেই সামলে নিলেন। একটু হাসিও এসে পড়ল তাঁর ঠোঁটের

কোণে। বিলেত থেকে কত লোকই তো আসছে, কত লোকই তো যাচ্ছে, এতে আজকাল আর চমকাবারই বা আছে কী, কৌতূহলেরও বা আছে কী!

সব-কিছু চিন্তা মন থেকে মুহূর্তে সরিয়ে ফেলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুখার্জি। জাহাজ এবার বাঁক নিচ্ছে। ব্রিজের ওপর রীতিমত ছুটোছুটি শুরু হল তাঁর এবার। হাঁকডাক আর ছুটোছুটি।

জেটিতে জাহাজ বাঁধতে বাঁধতে কেটে গেল আরও আধ ঘণ্টা।

এক নম্বর জেটিতেই জাহাজ লাগছে। জেটির সামনে আর পিছনে দুটো নৌকো। দুটোতেই চারজন করে লোক। ওদের কাছে গুটিয়ে-রাখা লম্বা দড়ি আছে, দড়ির মাথায় গল্‌ফ্‌ বলের মত বল বাঁধা। তাক করে দড়ি তারা ছুঁড়ে দিল জাহাজের ডেকের দিকে,—অমনি খালাসীরা ধরে নিল সেই দড়ির প্রান্ত। তারপরে, জাহাজের মোটা কাছির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল সেই দড়ি। বেঁধে, ধীরে ধীরে কাছিটা নামিয়ে দিল নীচে। নৌকোর লোকেরা এমনি করে কাছির প্রান্ত সংগ্রহ করে নৌকোর সাহায্যে তীরে এসে উঠে জেটিতে লোহার প্রকাণ্ড ক্যাপস্টানের সঙ্গে বেশ করে জড়িয়ে সেই কাছি বাঁধল। সামনে আর পিছনে দুটো কাছি। কাছি দুটোর অপর প্রান্ত রয়েছে জাহাজে। উইন্‌চের সাহায্যে খালাসীরা জাহাজের দড়ি যত গুটিয়ে আনবে, তত জেটির গা ঘেঁষে এসে লাগবে জাহাজ। এ তো গেল জাহাজের বাঁ দিকের ব্যাপার। ডান দিকেও অমনি করে সামনে-পিছনে কাছি বাঁধা হল ভাসমান বয়ার সঙ্গে।

একে একে সমস্ত কাজ শেষ হবার পর মুখার্জি বললেন, ও-কে।

ধীরে ধীরে একটা কাঠের সিঁড়ি জেটি থেকে তুলে জাহাজে লাগাতে লাগল জেটির ক্রেনটা।

এখুনি আসবে কাস্টম্‌স্‌ আর পুলিসের লোক, এজেন্ট আর তার ঠিকাদারেরা।

ক্যাপ্টেন বললে, আসুন, একটু কফি খেয়ে যান।

—চলুন।

কফি খেতে খেতেই দরকারী কাগজপত্রগুলি সব পোলায়ার ব্যাগ থেকে বার করে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে দিয়ে যথারীতি সই করিয়ে নিলেন মুখার্জি।

জাহাজে ভিড় বাড়ছে। কাস্টম্‌স তার কাজ করছে। পুলিস দিচ্ছে তার ছাড়পত্রাদি সই করে জাহাজের লোক বা প্যাসেঞ্জারদের নেমে যাবার জন্য। আসছে এজেন্টের লোক। জাহাজের প্রায় সমস্ত খালাসী সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে উন্মুখ হয়ে আছে। কাছে আসতেই ব্যাকুল আগ্রহে এক-একজন প্রশ্ন করছে, এনি মেল্‌ ফর্‌ মি ?—অর্থাৎ, আমার কোন চিঠি আছে ?

—প্রচুর। কার কার, তা জানি না। ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

এজেন্টের লোক ক্যাপ্টেনের কাছে চিঠির গুচ্ছ নিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন, তা হলে এবার চলি ক্যাপ্টেন। গুডবাই।

—গুডবাই। আবার দেখা হবে।

থেমে গেলেন মুখার্জি। বলতে গেলেন—না ক্যাপ্টেন, আর দেখা হবে না। আমি আজ রিটায়ার করছি।

কিন্তু বলা হল না। চিঠির গুচ্ছ হাতে নিয়ে সেই দিকেই মন দিয়েছে ক্যাপ্টেন, এখন অন্যের অন্য-কিছু শোনবার আগ্রহ তার নেই। আর ও-কথা ওকে বলে তাঁরই বা কী লাভ ?

ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নেমে এলেন মুখার্জি। কেমন যেন হাতটা কাঁপছে অকারণ, চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। গলার কাছে কিসের এক অব্যক্ত আবেগ যেন মথিত হয়ে

উঠেছে। কী এক অশ্রুত রাগিণী যেন বাণী চেয়ে ছটফট করে মরছে তাঁর মধ্যে।

কিন্তু না, তিনি আর-কিছুতেই ফিরে তাকাবেন না 'স্টিল ম্যারিনারে'র দিকে। জোর করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বোটে গিয়ে উঠে বসলেন। যাবেন সোজা একেবারে অফিসে।

ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন রড্‌রিগ। 'স্টিল ম্যারিনারে'র কাগজপত্র তাঁর সামনে রেখে তাঁকে সব বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিয়ে তক্ষুনি চলে আসবেন মুখার্জি, হঠাৎ ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, একদৃষ্টে তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন রড্‌রিগ।

একটু থেমে থেকে মুখার্জি বললেন, কী? কিছু বলবে আমাকে?

—হ্যাঁ।—যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল রড্‌রিগের কণ্ঠস্বর, এমনি ধীর শান্ত। বললেন, একসঙ্গে এত বছর কাটালাম, আজ তুমি যাচ্ছ। অনুষ্ঠান তুমি চাও নি, অফিসের লোকেরা তাই কোনও অনুষ্ঠান না করে সবাই মিলে চাঁদা করে তোমাকে এই সামান্য জিনিসটি তৈরি করে উপহার দিয়েছে। এটি নাও।

রূপো দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটি টাগের মডেল। যেন ক্ষুদ্রকায় মেঘাদ্রি। রড্‌রিগের ভাষায়,—কচি খুকীটি যেন।

দুই হাতে ধরে মডেলটা একেবারে বুকের ওপর চেপে ধরলেন মুখার্জি, বললেন, কী চমৎকার!

তারপর, একে-একে অফিসের ছোট-বড় সবাই এল দেখা করতে। এক-একজন করে সামনে এল, আর পরক্ষণেই সরে গেল। এ-ও এক সময় শেষ হয়ে গেল। মুখার্জি বললেন, এবার যাই?

একটু এগিয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালেন মুখার্জি, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন, তুমি কিন্তু সেই কথাটা আমাকে বললে না!

—কোন্‌টা ?

—সেই যে কাল যেটা রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলে ? There cannot be any farewell...

সঙ্গে সঙ্গে রড্‌রিগ এগিয়ে এসে উপহার-শুদ্ধ ওঁর হাত দুটো ধরে কথা বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলেন না—আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর, চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠল। একজন বাংলার, অপরজন সেই সুদূর স্কটল্যাণ্ডের। কিন্তু স্পন্দিত দুটি হৃদয়ের ছোঁয়ায় কলকাতা আর এবার্ডিন ততক্ষণে একেবারে একাকার হয়ে গেছে।

আর কোনও কথা হল না কারও সঙ্গে। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠছেন, জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাই তা দেখল। কেউ কথা বলল না, এমন কি হাতও তুলল না। না তুলে, এই বিদায়-মুহূর্তটিকে যেন আরও করুণ, আরও মুহ্যমান করে দিল।

নির্জন বীচ রোড দিয়ে গাড়ি ফিরে চলেছে তাঁর বাসার দিকে। বেলাভূমির ওপরে কয়েকটি জেলে তাদের লম্বা আর বিরাট জালগুলি শুকতে দিয়েছে। কেউ কেউ এক-এক জায়গায় বসে ছেঁড়া জালের টুকরোগুলি সেলাই করে চলেছে একমনে। দেখে মনে হয়, বিশ্বসংসারে এই যে এত ওঠাপড়া চলেছে প্রতিটি মুহূর্তে,— ওদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কৌতূহলও নেই, ওরা নির্বিকার।

গাড়ি যথারীতি গ্যারেজে উঠিয়ে দিয়ে বারান্দা পার হয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন মুখার্জি। রামস্বামী ছুটে আসতে থমকে থেমে প্রশ্ন করলেন, মেমসাব কোথায় ?

হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দিল, ঘরেই আছেন।

বোধ হয় স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলে বসে হালকা প্রসাধনেই বুঝি ব্যস্ত ছিলেন নীলিমা।

মুখার্জি তাঁর সামনে রূপোর মডেল টাগটা রেখে বলে উঠলেন, দেখ এটা। অফিসের লোকেরা দিয়েছে।

নীলিমা হাত দিয়ে উপহারটা একটু ছুঁয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, সুন্দর।

খাটের ওপর বসে পড়লেন মুখার্জি, বললেন, গৌতম ইস্কুলে বেরিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—কী ঠিক হল ? পরীক্ষা ওর সামনে। সেই অ্যালইসাস্ স্কুলের হস্টেলেই ও থাকবে তো ?

—হ্যাঁ। রেভারেণ্ডকে আমি ফোন করে দিয়েছি। ওর বিছানা বাক্স বইপত্তরও আলাদা করা আছে। কাল সকালেই ও হস্টেলে চলে যাবে।

—পরীক্ষার পর গৌতম একা-একা কলকাতা যেতে পারবে তো ?

—খুব পারবে।

মুখার্জি বললেন, যাক, এদিকেও শেষ হয়ে গেল। এবার যাবার পালা।

—যাবার পালাই তো। তবে, অনেক-কিছু গুছতে আমাদের এখনও বাকী।

—হয়ে যাবে।

নেলী বলল, ভাল কথা। কে একটি মেয়ে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—মেয়ে !

—হ্যাঁ।

—কে মেয়ে ?

—দেখ না গিয়ে।

—কোথায় ?

—বাইরে। বারান্দায়।

উঠলেন মুখার্জি। কাঠের জাফরি-কাটা বারান্দার এক কোণে বেতের কতকগুলি চেয়ার আর টিপয় সাজানো। তারই একটি চেয়ারে চুপচাপ এতক্ষণ বসে ছিল মেয়েটি, কালোপাড়ের সাদা

একটা শাড়ি পরনে। ওকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণাম জানাল।

—কে?

—আমি সোমা।

ধবধবে ফরসা ওর গায়ের রঙ, মুখের ভাবটি ভারি কোমল, ভারি মনোরম মনে হল। কত বয়স হবে? চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়। কিন্তু, কে এ? সোমা নামের কোন মেয়ের কথা তো মনে পড়ে না!

—ঠিক চিনতে পারছি না তো?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি তাঁর হাতে দিল। বললে, এই চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

ফিকে নীল রঙের একটি খাম, গোটা-গোটা অক্ষরে তাঁর নাম লেখা—বাংলায়। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু বিদ্যুতের জ্বালা দিয়ে রচনা করা কয়েকটি অক্ষর যেন!

পড়া শেষ করেই মুখ তুলে তাকালেন মেয়েটির দিকে। যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ। ছোট্ট কপাল, ভুরু, দুটি চোখ, ঠোঁট, চিবুক—সব যেন ধীরে ধীরে ছায়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার চিঠির দিকে চোখ নামালেন, চিঠির কথাগুলোও যেন ঝাপসা—পড়া যায় না। আবার চাইলেন মেয়েটির দিকে, তারপরে আবার চিঠি।

কিন্তু কোথায় কে! সব যেন মুছে যাচ্ছে। সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যার কুলায় ফিরে-আসা এক ঝাঁক পাখি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত কলরব করে চলেছে না?

একটা চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন মুখার্জি। বোধ হয় তিনি পড়েই যাচ্ছিলেন। অদৃশ্য কোন শক্তি মুহূর্তে তাঁকে প্রবল নাড়া দিয়ে নীচেই ফেলে দিচ্ছিল বুঝি।

কিছুক্ষণের মধ্যে শক্তি ফিরে পেলেন মনে হচ্ছে। পাখির

কলরব নীরব হয়ে গেছে। অন্ধকার মুছে গিয়ে আলোও দেখা দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

চেয়ারে বসে পড়ে আবার মেলে ধরলেন চিঠিটা চোখের সামনে। বেশ পড়া যাচ্ছে এবারে। 'ইতি সুজাতা'—শব্দ দুটি ওই তো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

চিঠিখানা আবার বন্ধ করে মেয়েটির দিকে তাকালেন মুখার্জি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে মেয়েটি। তাঁর অবস্থা দেখে কিছু একটা তার করা দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু কাছে আসবে কি আসবে না—বুঝতে পারছে না। কাছে এসে তাঁকে তার সাহায্য করা উচিত কি না, তাও ঠিক বিচার করে উঠতে পারছে না।

মুখের ভাব দেখেই সত্যিই মন কোমল হয়ে আসে, সত্যিই মায়া জাগে মেয়েটির ওপরে। ওর পাশেই মেঝের ওপরে রাখা ওর সুটকেসটা,—তাতে জাহাজের-ছাপ-দেওয়া লেবেল লাগানো রয়েছে তখনও। সেই দিকে একবার তাকিয়ে আবার ওর চোখের দিকে তাকালেন মুখার্জি। বড় বড় টানা টানা দুটি চোখ,—মণি দুটি কালো। কালো ওর মাথার চুল। একটি বেণীতে বাঁধা হয়ে পিঠের উপর দিয়ে ঝুলে আছে।

কত কী কথা একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মুখ দিয়ে মাত্র বেরিয়ে গেল একটি কথা : সোমা বুঝি তোমার নাম?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি সরে এসে একেবারে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে ওঁকে প্রণাম করল এবার।

অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক্ থাক্, হয়েছে। তুমি বোস।

মেয়েটি তখনই কিন্তু বসল না।

মুখার্জি একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন, 'স্টিল ম্যারিনারে'ই তো এলে, না?

—হ্যাঁ। আপনিই তো পাইলটিং করে নিয়ে এলেন!

—ঠিক। আমিই পাইলট। বলতে গেলে আমিই নিয়ে এসেছি তোমাকে। কিন্তু—তুমি বোস।

অনেক দ্বিধার পর এতক্ষণে তার সামনের চেয়ারে এসে বসল মেয়েটি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন মুখার্জি, জাহাজে আমাকে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—চিনলে কী করে?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল, নিমেষে রাঙা হয়ে উঠল মুখখানা, তারপরে কোনক্রমে বললে, প্রথমে চিনতে পারি নি।

—তার পর?

বললে, আপনি যে এখানে, তা তো জানতাম।

—কী করে?

—মা জানত। কীভাবে যেন খোঁজ পেয়েছিল।

—সেটা সম্ভব হতে পারে।

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে তারপরে একটু থেমে থেমে বলতে লাগল, আপনাকে দেখিয়ে জাহাজের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ইনি পাইলট না? সে বললে—হ্যাঁ।

—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিনতে পারলে?

—না। মার কাছে যে ফোটো আছে, সে চেহারা থেকে অনেক তফাত হয়ে গেছে।

—তবে?

মেয়েটি আবার একটু থামল, একটু দম নিয়ে বললে, যে কাস্টমস-অফিসারটি আমার জিনিসপত্র দেখতে এসেছিলেন, তাঁকে বললাম আপনার নাম। তারপর দূর থেকে আপনাকে দেখিয়ে বললাম—উনি কী? তিনি বললেন—হ্যাঁ।

—তার পর?

মুখ নীচু করেই প্রায়শ কথা বলছিল মেয়েটি, সেইভাবেই বলতে লাগল : তার পরেই আপনি নেমে গেলেন। জাহাজ থেকে আমার বেরুতে বেরুতে তার পরেও অনেক দেরি হল। বাইরে বেরিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে আপনার বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

—কষ্ট হয়েছে তো খুঁজে বার করতে?

—না না, তেমন কষ্ট আর কী?

মেয়েটির আর কোনও কথা নেই। কিন্তু ওঁর তো আরও কিছু কথা বলা দরকার। কিছু না-বলাটা ভাল দেখায় না। নেলীই বা এসে পড়ছে না কেন এখনও? যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক—ঝড়ঝঞ্ঝা, যা হোক কিছু।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একসময়ে বলেই ফেললেন মুখার্জি, কিন্তু এমন ভাল বাংলা বলতে তুমি শিখলে কেমন করে?

লজ্জিত হয়ে আবার মুখ নীচু করল মেয়েটি, বললে, মা শিখিয়েছে।

চুপ করে রইলেন মুখার্জি। আর কী বলবেন? এরও পরে আর কী কী প্রসঙ্গ শুরু করা যেতে পারে? সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছিলেন তিনি নিজের মনের অবস্থা দেখে। ভিতরটা দমকা ঝড়ের হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু বাইরে তার কিছুই কোন প্রকাশ পেল না। বেশ স্বচ্ছন্দে সাধারণভাবে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি, গলার স্বর একটুও কাঁপছে না, কথা একটুও আটকে যাচ্ছে না।

বিস্মিত হচ্ছেন তিনি মেয়েটিকে দেখে? না, নিজেকে দেখে?

এতক্ষণ পরে নীলিমাকে দেখা গেল বাইরের বারান্দায়। পায়ে পায়ে সে এবার এদিকেই আসছিল। কাছে এসে থামতেই তাকে দেখিয়ে মেয়েটিকে বলে উঠলেন মুখার্জি, এঁকে প্রণাম কর। তোমার মা।

—মা!

কথাটা শুনে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা। মেয়েটি তার পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করল, সে যেন তখন অনুভবই করতে পারল না কিছু।

অনেকক্ষণ পরে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল সে। বলল, অ্যাঁ! কী বললে! কে ও?

—সোমা। আমার মেয়ে।

—মেয়ে!

—হ্যাঁ। ওর মার নাম সুজাতা।

—সুজাতা!

—হ্যাঁ। সে অনেক কথা। পরে বলছি। মেয়েকে আগে কাছে টেনে নাও। অনেক দূর থেকে আসছে ও। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে।

দুই

নেলীর মস্ত গুণ, তাদের দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি আর বিক্ষোভ ঘটে গেলেও তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছুতেই কিছু প্রকাশ করবে না সে। ভিতরের ঘরে দুজনে কতদিন কত কলহ করেছে চাপা কণ্ঠে, কত ভুল বোঝাবোঝি, কত মন কষাকষি। দুরন্ত ক্রোধে আর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপেছে হয়তো নেলী, মনে হয় সংসারে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে আজ। কিন্তু বসবার ঘরে কোন আগন্তুক এসেছে শুনলে পরক্ষণেই উপস্থিত হয়েছে তার সামনে হাসিমুখে। অতি শান্ত, অতি মৃদু ঝঙ্কার-তোলা তার কণ্ঠস্বরঃ এই যে মিসেস শান্তনম্। মাদ্রাজের মহিলা-সম্মেলন শেষ করে ফিরে এলেন কবে? কী চমৎকার লাগছে, আপনি এসেছেন! খু-ব খুশী হয়েছি।

এবারেও ঠিক তাই হল। সোমাকে যখন ডেকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল নীলিমা, তখন ওর মুখ দেখে বাইরের কারুর কি কিছু বোঝবার উপায় আছে যে, ওর মনের ভিতরে কীসের আলোড়ন চলেছে! বুঝলেন মুখার্জি নিজে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলেন, ঈশ্বর কৃপা করেছেন যে প্রসাধনের শখটা প্রৌঢ়ত্বেও ওর বজায় আছে। স্নান-পরবর্তী প্রসাধন—অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে ওর মুখের ভাব। আর ভাগ্যিস গেছে! নইলে কী অসুবিধাই না বোধ করত সোমা!

যে-ক্লাবে যাওয়ার আগ্রহ নেলীর সর্বাধিক, রাত্রে সেই ক্লাবেই সে গেল না শেষ পর্যন্ত। বললে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তুমি যাও। তোমার যাওয়া দরকার।

—একা একা ?

ঘরে মাত্র ওরা দুজনেই তখন। নীলিমা তার বিছানায় শুয়ে। মাথাটা বালিশের ওপরে ভাল করে উঠিয়ে ওঁর দিকে সোজা-সুজি তাকিয়ে বলে উঠল, কেন? তোমার মেয়ে—তাকে নিয়ে যাও না।

সারাটা দিন যতবারই ঘরে দুজন মাত্র থেকেছেন, ততবারই শুনতে হয়েছে এই ধরনের শ্লেষ। বিস্তৃত কিছু নয়, ছোট-ছোট কাটা-কাটা কথা। যেমন—রটনা বিয়ের আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করি নি তখন।

—কেন ?

—ইয়োরোপ গেলেই পুরুষদের নিয়ে ও-ধরনের রটনা হয়। একটু-আধটু রোমান্সও হয়। ওসব গায়ে মাখার কথাই নয়।

—তবে ?

—কী তবে ? এতটা যে সব-কিছু সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা তো সত্যি-সত্যিই ভাবতে পারি নি।

—ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল তখন।

—তোমারও উচিত ছিল স্ত্রীকে সব-কিছু খুলে বলা।

—কিন্তু বলব কী ?

—যা ঘটেছে।

—কী ঘটেছে ?

—টের পাবে। টিটিক্কার পড়ে যাবে চারিদিকে। স্ক্যাণ্ডালাস !

চুপ করে ছিলেন মুখার্জি।

নেলী আবার এক সময় কথা তুলেছিল : কোথায় সেই মেম ?

ম্লান হেসে বলেছিলেন মুখার্জি, তাকে আবার কেন? পঁচিশ বছর হল বিলেত থেকে এসেছি। তার প্রায় সাত বছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এই আঠারো বছরে তার কোন ছায়া তুমি দেখেছ ? তার কোন চিঠি ?

—তবে এটা কী ? এই মেয়ে ?

কী হবে কথা বাড়িয়ে? অনড় অচল নিরুত্তর ছিলেন মুখার্জি।

এবারে ক্লাবে যাওয়ার প্রশ্নে ইচ্ছা হল, চিৎকার করে সব-কিছু খুলে বলেন। ইচ্ছা হল, চিৎকার করে বলেন—অপরাধ কার, তা তুমিই বিচার কর হে ঈশ্বর।

কিন্তু না, অতি কষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে। শান্ত ধীর কণ্ঠে শুধু বললেন, মেয়েকে ক্লাবে নিয়ে যাবার কথা বলছ? যেতাম নিয়ে। ওর বাবার ফেয়ালওয়েলকে ও না হয় নিজের চোখে দেখত। কিন্তু, অতদূর থেকে এসেছে, ও শ্রান্ত। শুয়ে বিশ্রাম করছে।

বলেই আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দায় এসে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন। কাছের গির্জাটায় বোধ হয় ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। না, আর দেরি করা চলে না। যেতে যখন হবে, তখন এখুনি যাওয়া উচিত।

সিঁড়িতে পা দিয়েও বারান্দার সেই জাফরি-কাটা কোণটার দিকে আপনিই চোখ চলে গেল। অমন অন্ধকারে আলো না জ্বালিয়ে কে ওখানে বসে? কে যেন বেতের একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে না?

কী মনে করে যেন ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ওদিকে। বলে উঠলেন, কে?

বসে-থাকা মূর্তিটি ঈষৎ চমকে কেঁপে উঠল যেন। তারপরে মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিল, আমি।

—গৌতম?

—হ্যাঁ।

—এখানে এমন করে বসে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল গৌতম। পায়ে পায়ে ওঁর কিছুটা কাছে এসে থেমে গেল, বললে, ও কে?

—কে? কার কথা বলছিস?

—মেয়েটি?

এক মুহূর্ত থেমে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন মুখার্জি, তোর দিদি।

—ও।

—আর-কিছু বলবি ?

—না।

পনরো বছরের ছেলে, নিজের পড়াশুনা নিয়ে যে মগ্ন, সন্ধ্যাবেলা বাবাকে কাছে পেলে শেক্সপিয়ারের বহুলপ্রচলিত নাটকগুলি নিয়ে যে ছেলেমানুষী সব প্রশ্ন করতে আসে, সেই খোকা—সেই গৌতম যেন মুহূর্তে একেবারে প্রবীণ হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন ? সোমাকে ও নিশ্চয়ই দেখেছে, কিন্তু ও-ও কি সহ্য করতে পারছে না ওকে ?

ক্লাবের কলরব থেকে শেষ বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় বারোটা। নিঃঝুম নিষুতি হয়ে গেছে বাড়ি। রামস্বামী যথারীতি দরজা খুলে খাবার ঘরের আলো জ্বালছিল। তাকে হাত নেড়ে বারণ করলেন মুখার্জি। রাত্রের খাবার ক্লাবেই শেষ করে এসেছেন।

পোশাক-টোশাক বদলে শোবার ঘরে এসে দেখেন, তখনও প্রখর সাদা আলোটা জ্বলছে স্নিগ্ধ নীলাভ আলোর পরিবর্তে। নীলিমা তখনও জেগে, কী-একটা বই পড়ছে যেন শুয়ে শুয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর মুখার্জিই প্রশ্ন তুললেন, সোমা কোন্ ঘরে ?

বইটা মাথার কাছের টেবিলে হাত বাড়িয়ে রেখে দিয়ে নীলিমা বলল, পশ্চিমের ঘরে।

—ঘুমচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। নীলিমা বলল, একটা কথা ভাবছি।

—কী ?

মুখটা ফিরিয়ে ওঁর দিকে সোজাসুজি তাকাল নীলিমা, বলল, এ বাড়িটা আরও মাসখানেক কি রাখা যায় ?

—তা কেন যাবে না ? নতুন পাইলট এখন কেউ আসছে না। অফিসে একটা ফোন করে দিলেই হবে।

—তা হলে আমি বলি কী—নীলিমা তাড়াতাড়ি বলল, আমি বরং থেকে যাই। মাসখানেকের মধ্যেই গৌতমের পরীক্ষা-টরিক্ষা হয়ে যাবে। একেবারে ওকে নিয়ে ফিরব।

মুখার্জি নিরুত্তর।

কয়েক মুহূর্ত ওঁর কথার অপেক্ষায় চুপ করে থেকে তারপরে নীলিমা বলল, কী, অমত আছে নাকি ?

বলেই ওঁকে কোন সাড়া দেবার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে যেতে লাগল নীলিমা, অমতের কিন্তু কোনও মানে হয় না। গৌতম ছেলেমানুষ, আজ পর্যন্ত কখনও ছেড়ে থাকে নি আমাকে। হস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিতে গেলে ওর কষ্ট হবে। আই মীন, মানসিক কষ্ট।

অলক্ষ্যে একটু হেসেই ফেললেন মুখার্জি। গৌতমের হস্টেলে থাকবার ব্যবস্থা-পত্র সব নিজের মত অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিজেই করেছিল নীলিমা। এবং যখন করেছিল, তখন গৌতমের 'মানসিক কষ্টে'র কথা একবারও ভাবে নি সে। তখন একবারও বলে নি—আমি থাকি। তুমি যাও। মাসখানেক পরে কোয়ার্টারটা ছাড়লেই হবে।

মুখার্জি বললেন, আমাকে কিন্তু কালই যেতে হবে। সেই ভাবে চিঠি গেছে। তা ছাড়া, নতুন বাড়ির ব্যাপার-ট্যাপার—

—সে তো বটেই।—নীলিমা বলল, তুমি কালই যাবে। সঙ্গে তোমার মেয়েকেও নিয়ে যাও।

ঠিক এই কথাটাই আশা করছিলেন মুখার্জি। মনে মনে প্রতিক্ষণ এই ধরনের কথারই প্রতীক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ

বাড়িয়ে লাভ নেই, কলহেরও প্রয়োজন নেই। সোমাকে নিয়ে যে প্রবল ঝড় উঠেছে সংসারে, তার প্রকাশটা আর যাই হোক, শালীনতা আর শোভনতার সীমা অতিক্রম করে না যায়। অন্তত, সোমা নিজে যেন কিছু বুঝতে না পারে। ভালই হল, ওকে নিয়ে কালই চলে যাবেন তিনি।

পাশ ফিরে অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন মুখার্জি। শেষ জাহাজ বন্দরে নিয়ে এলেন তিনি, 'স্টিল ম্যারিনার'! আর এই জাহাজেই এল তাঁর মেয়ে সোমা।

আশ্চর্য, ঠিক এই মুহূর্তে সোমার মুখখানা ভাল করে মনে পড়ছে না। ধবধবে ফরসা ওর গায়ের রঙ—ঠিক ওর নিজের মায়ের মত। কিন্তু মুখ? মুখখানা কার মত? মনে করতে চেষ্টা করলেন মুখার্জি। ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে ভাল করে কথা বলারও অবকাশ হল না। কেমন যেন নির্জীব নিথর হয়ে গিয়েছিল তখন মনটা। কেমন দেখতে ওর মুখখানা? সেই তো বাইরে বসে ছিল বারান্দায় সাদা শাড়ি পরে। অমন করে শাড়ি পরাই বা শিখল কার কাছে? ওর মা তো শাড়ি পরত না। জানতও না শাড়ি পরতে। তবে?

জাহাজে রেলিং-ধরে-দাঁড়ানো একটি মেয়েকে তখন দেখেছিলেন, কিন্তু সে যে সোমা, তাঁরই মেয়ে—বলতে গেলে তাঁরই প্রথম সন্তান, শুধু তাঁরই সন্ধানে একেবারে একা বেরিয়ে পড়েছে সেই সুদূর দেশান্তর থেকে—কে জানত এ কথা!

কিন্তু কার মত দেখতে ওর মুখখানা? এখন মনে হচ্ছে, রঙের কথা বাদ দিলে, চোখ-নাক-চিবুক-কপাল সব মিলিয়ে একেবারে মিলি—তাঁরই হারানো মিলি।

—বাবা, তুমি আমার নাম রেখো, বাসন্তী।

সেই বাসন্তীই যেন ফিরে এসেছে সোমা হয়ে।

এই কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে গায়ের কম্বল সরিয়ে বিছানা ছেড়ে মেঝের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি, স্মরণ নেই,

হঠাৎ চমক ভাঙল খোলা দরজাটার কাছে এসে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন তিনি? পশ্চিমের ঘরে? সোমাকে দেখতে? দেখতে তাঁর বাসন্তীকে?

না, ঘুমুচ্ছে সে—ঘুমুক। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন মুখার্জি। ঘরের জোরালো সাদা আলোটা তখনও জ্বলছে,—মাথার কাছে বইটা খোলা। নীলিমা কখন যেন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, আলোটা নেবাতেও পারে নি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মুখার্জি। মাথাটা বালিশ থেকে সরে গিয়ে কাত হয়ে গেছে। সন্তর্পণে বালিশটা সরিয়ে দিলেন, ঘুম না ভেঙে যায় ওর।

ঘুম অবশ্য ভাঙল না, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি, চোখের কোণ বেয়ে গালের অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখের জলের একটি ধারা বিশুষ্ক মরুনদীর মত রেখায়িত হয়ে আছে।

কিন্তু কেন এ কান্না! জীবনের মূল্যবান আঠারোটি বছর তোমাকেই তো দিয়েছি নেলী! নিছক তোমাকেই।—মনে মনে বলে উঠলেন মুখার্জি—কোনদিন তোমার কোন ইচ্ছায় বাধা দিই নি। যেখানে নিয়ে গেছ, গেছি। পার্টি, ভোজসভা, তোমার আত্মীয়মণ্ডলী—কাউকেই অবজ্ঞা করি নি। তোমার রুচিমত ঘর সাজিয়েছি, পোশাক পরেছি। এই আঠারোটি বছর কেউ ছিল না, শুধু তুমি আর তুমি। ভয় নেই। ওই অতটুকু মেয়ে কিছুই করতে পারবে না তোমার। ও আসছে, কিন্তু সে আসবে না। আসবার হলে অনেক আগেই সে আসত।

আলোটা নিবিয়ে দিলেন মুখার্জি। ঘর অন্ধকার।

সারাদিন যখনই সময় পেয়েছেন, সুজাতার চিঠিটা পড়েছেন। প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে। কোথায় আছে চিঠিটা? সোমার কাছ থেকে চেয়ে তো নিজের কাছেই রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। বোধ হয় পকেটে আছে। ছোটই চিঠি।

—তোমার মেয়ে, সোমা। এ পৃথিবীর আলো বাতাসকে ও অনুভব করবার আগেই তুমি চলে গিয়েছিলে। তোমার দোষ নেই, আমিই বলেছিলাম চলে যেতে। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। এই পঁচিশ বছর ধরে তোমার মেয়েকে আমি মানুষ করার চেষ্টা করেছি। বলেছি, তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে। ও তাই হতে চেয়েছে। আজ বলে, ও যাবে ভারতবর্ষে। ভারতকে দেখবে। ভারতকে জানবে। বুঝলাম, ওকে আর বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ও যাবেই।

—অবশ্য, ও বড়ো হয়েছে, ভাবনার কিছু নেই। তবু আমার মায়ের মন তো?

—তাই এ-যাবৎ যা করি নি, তাই করলাম। মেয়ে জানত, তার বাবা ভারতীয়, কিন্তু নাম-ধাম জানত না। আমার মুখ চেয়েই বোধ হয় কোনদিন কোন জিদ ধরে নি। বলে দিলাম ওকে তোমার নাম আর ধাম। তুমি কোথায় আছ, তা জানা আমার ক্ষে কঠিন নয়। তুমি যে ইণ্ডিয়ান পাইলটিং সার্ভিসে তা তো জানতামই। মাস্টার টিকিট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। একদিন মেরিন বুলেটিনে দেখলাম তোমার নাম। বাঙালী পাইলট তোমাদের দেশে মাত্র জনকয়েক তোমরা আছ, তাই বছরের পর বছর বুলেটিনের খোঁজ রাখলে তোমার গতিবিধি জানা কঠিন হয় না। মেয়েকে বললাম—ভাইজাগেই যাও। সবার আগে দেখা কর তোমার বাবার সঙ্গে। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তার-পরে যা হয় কোর।

—মেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝেছিল কে জানে, বললে—মা গো, বাবার কাছে গিয়ে ওঁর সংসারে আমি অশান্তির ঝড় তুলতে চাই না, আমি তাঁকে একবার দেখব শুধু।

—আর আমার কিছু বলার নেই। বিয়ে নিশ্চয়ই করেছ। ছেলে-মেয়েদের আমার আশীর্বাদ জানিও। ইতি—সুজাতা।

সব-কিছুর ওপর একদিন চমৎকারই 'ইতি' করে দিয়েছিল

সে। কিন্তু তার পরেও তো 'পুনশ্চ' বলে কিছু থাকে কখনও-সখনও। সোমা কি এসেছে সেই 'পুনশ্চ'র বার্তা বহন করে?

জীবন তো সায়াহ্নের দিকে ঢলে পড়েছে। কর্মচক্র থেকেও আজ নিচ্ছেন বিদায়। ভেবেছিলেন, বুঝি শেষ হল সমস্ত অধ্যায়, এবার বিরাম। কিন্তু সমগ্র জীবন-তরণীর যিনি কর্ণধার, তাঁর অভিলাষ বোধ হয় ভিন্নরূপ। যেখানে সমাপ্তির রেখা টানার কথা, সেখান থেকে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। তাই, 'ইতি—সুজাতা'র পরেও জীবন-লিপিকায় অদৃশ্য কালি দিয়ে রচিত হল পুনশ্চের কথা—সোমা।

সোমা নয়, মিলি। মিলি নয়, বাসন্তী। কী দেখতে এসেছ মা তুমি? ভারতবর্ষ? কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষ?

সেও একদিন বলেছিল ঠিক এমনি কথা। গ্লাসগোর ছাত্রজীবন। ল্যাণ্ডলেডির বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করতে আসত সে। কীভাবে যে প্রথম পরিচয়, কীভাবে যে তার পরিণতি—স্মৃতির পৃষ্ঠায় তা অক্ষয় হয়ে আছে। কতটুকু আজ তার প্রকাশ করা যেতে পারে? কতটুকু তার বোঝাতে পারা যাবে অপরকে? কী খেয়াল যে তার হয়েছিল, বাংলা শিখতে শুরু করল তাঁর কাছে। বাংলা শিখেও ছিল। মুখার্জি তার নাম দিয়েছিলেন—সুজাতা। ডাকতেনও সুজাতা বলে। একদিন বলেছিলেন, সুজাতা, তোমাকে আমি বিয়ে করব।

—না। আনুষ্ঠানিক বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই।

—আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চল।

—না।

—কিন্তু, যে-সন্তান তোমার কোলে আসছে?

—তার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

—কিন্তু, আমারও তো একটা কর্তব্য আছে?

সুজাতা বলেছিল, সে কর্তব্য যদি করতে চাও তো কোনদিকে

না তাকিয়ে নিজেকে গঠন কর। উন্নতি কর জীবনে। আমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে পদক্ষেপ করে তোমার নিজস্ব জীবনকে জটিল করতে চাই না।

—জটিল করবে কেন ?

—ভেবে দেখ।

মুখার্জি বলেছিলেন, ভাববার কী আছে ? কত লোকই তো আমাদের দেশে ইয়োরোপীয়ান বিয়ে করেছে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে দেশে।

—জানি। অনেক গল্পও পড়েছি, শুনেছি।

—তবে ?

হেসে বলেছিল, ওই 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত। শুধু এটুকু বলব, বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি কোর না। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অন্য। ঘরের বউ হতে চাই না।

—তবে ?

হেসে বলেছিল, দেখলে তো ! ঘুরে-ফিরে ওই 'তবে'তেই এসে দাঁড়াচ্ছ। কী কাজ অত 'তবে' 'তবে' করে ? তোমার তো কোনও দোষ নেই। আমি নিজে চেয়েছিলাম মা হতে। না না, কোন দায়িত্ব তোমার ওপর চাপাব না আমি।

—কিন্তু তোমার প্রেম ?

বলেছিল, প্রেম আমার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে। ত্যাগ করেই তো ভোগ, তোমাদের দর্শনে বলে না ?

না। অত করেও সেদিন টলানো যায় নি সুজাতাকে। বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে কোর। আমার জন্য ভেবো না।

সে এক অদ্ভুত বিপর্যয় গিয়েছিল জীবন ও মনের উপর দিয়ে। এত কথা, এত অনুনয়-বিনয়। তবু এক বিন্দুও টলে নি সুজাতা। বললে, যে দিন থেকে পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করতে ঢুকেছিলাম; সেদিন থেকেই আমার জীবনের লক্ষ্য আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম। মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ১৯১৮তে। কিন্তু আজ ১৯৩২

সন পর্যন্তও ইয়োরোপের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘুচল না। আরও কত দুর্যোগ যে সামনে আসছে, কে জানে!

—তোমার-আমার বিয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী?

একটু হেসে বলেছিল, সম্বন্ধ একটা অবশ্যই আছে, নইলে এ-কথা উঠছে কেন? কিন্তু, থাক্ ওসব। তুমি একটা রাঁধুনীকে বিয়ে করে দেশে ফিরবে, এও তো কোনও কাজের কথা নয়!

—ভালবাসতে পারলাম, আর বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে দোষ?

একটু ম্লান হেসে বলেছিল, ভালবাসার কাহিনী এদেশের তুমি কটা জান? কত ভালবেসে কত মেয়ের সর্বনাশ করে কত পুরুষ যে কত দিকে গা-ঢাকা দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। কে তার প্রতিকার করছে? আর চাইছেই বা কত মেয়ে তার প্রতিকার?

ওর দুটি হাত ধরে মুখার্জি বলেছিলেন, আমাকে কি সেই পুরুষদের একজন মনে কর তুমি?

দুটি কোমল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, একেবারেই না। তুমি ভিন্ন। ভিন্ন না হলে আমাকে পেতে না। আমি সামান্য কাজ করি, আমি গরিব, কিন্তু আমার মনটা আমি জানি। যা করেছি, খেলাচ্ছলেই করি নি।

এত কথা বলেছে, এত অনুরাগ জানিয়েছে, তবু শেষ সে আসে নি জীবনে।

রুদ্ধ এক অভিমান বুকে নিয়েই একদিন তিনি ভেসে পড়লেন জাহাজে কাজ নিয়ে।

'মাস্টার'-টিকিট তাঁর দরকার। নইলে, পাইলটিং সার্ভিসে যাওয়া যাবে না।

সাত বছর কেটে গেল। সাত বছর পরে দেশে ফিরে হঠাৎই বিয়ে করলেন। বেশ বয়স তখন। সাঁইত্রিশ। জাহাজ থেকে কত চিঠি লিখেছিলেন গ্লাসগোতে, একটারও উত্তর নেই। অবশেষে ল্যাণ্ডলেডিকে চিঠি লিখতে সেই বৃদ্ধা সাড়া দিয়েছিলেন।

লিখেছিলেন—তুমি যাবার পরেই রোজি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কোথায়, তা জানি না।

অর্থাৎ সুজাতা কোথায়, জানা নেই।

সে ছিল না তাঁর জীবনে দীর্ঘদিন। সাঁইত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন—এই আঠারো বছর কেটে গেল। মিলি এল, গৌতম এল। একদিন মিলিও চলে গেল। কত কী ঘটল ওঠাপড়া—এর মধ্যে সুজাতাকে কি একদিনের জন্যও মনে পড়েছিল? এক-মুহূর্তের জন্যও?

না। মনে পড়ার মত করে একদিনও মনে পড়ে নি। যেন এক বিচিত্র আর তীব্র প্রবাহের স্রোতে ভেসে চলেছিলেন এই আঠারো বছর। কত বন্দর ঘুরলেন—কত জাহাজ আনলেন বন্দরে, কত জাহাজ বিদায় দিলেন। কাজ আর কাজ, আর ক্লাব, আর পার্টি। ছুটিতে ছুটিতে সপরিবারে কলকাতায় যাওয়া। ক্রমে একদিন কলকাতায় জমি কেনা। অবশেষে বাড়ি করা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্রমাগত যেন ছুটে চলেছেন তিনি, একবারও থামেন নি।

সন্তানসম্ভবা ছিল রোজি। কিন্তু, তার কোলে যে সন্তান এসেছিল, সে সন্তান যে বেঁচেও আছে, এত বড় হয়েছে,—কোনও সংবাদই সে দেয় নি কোনদিন। কিন্তু কেন দেয় নি? সন্তানের দায়িত্ব পিতার—এ দায়িত্ব এমন করে একাই সে বহন করেছে কেন এতদিন? তাকে তাঁর অদেয় তো কিছুই ছিল না! সে কথাও বলেছিলেন মুখার্জি। বলেছিলেন, না হয় দেশে ফিরব না। এখানেই কোন কাজ নিয়ে ঘর বাঁধব। তুমি রাজী হও সুজাতা। অদ্ভুত হাসি তার মুখে, বলেছিল, না, তা-ও হয় না। দেশে তোমাকে ফিরতেই হবে।

কিন্তু তারপর? সে কি পরে কোন বিয়ে করেছিল? এখন সে কী করছে? তার মত মেয়ের পক্ষে এখন কী করা সম্ভব?

ইস্পাত দিয়ে গড়া যেন এক মেয়ে, যে ভাঙে না বরং চারপাশের বাধাবিঘ্ন চুরমার করে নিজের পথ করে নেয়। আর তাঁদের প্রেম? সেও এক অদ্ভুত, অচিন্তনীয় ঘটনা। যেমন মধুর তার স্মৃতি, তেমনি সংঘাতসঙ্কুল সেই প্রেম।

সে-সূত্রে সেই বিধবা ল্যাণ্ডলেডি মিসেস পার্কারকে মনে পড়ে। সংস্কারাচ্ছন্ন, বিচিত্র এক জীব। বাংলাদেশের কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামের বালবিধবা এক মুখরা পিসী বা মাসী-জাতীয়া কাউকে যেন লালচে রঙ করে গাউন পরিয়ে সেই সুদূর স্কট্‌ল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরের এক প্রান্তের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থূলকায়া প্রৌঢ়া মহিলাটির এক ভাইঝি থাকে লণ্ডনে, কোন্ ছেলেমেয়েদের স্কুলে বুঝি শিক্ষকতা করে। সে ছাড়া মিসেস পার্কারের আর-কেউ নেই ইহজগতে।

এই প্রৌঢ়া নিয়েছিল তাঁকে পেয়িং গেস্ট হিসাবে। তাঁর প্রতি স্নেহ যে না ছিল এমন নয়, আবার গজগজ করতেও ছাড়ত না। কোন ব্যাপার তার মনোমত না হলেই বলত, এই ব্ল্যাকিকে নিয়ে হয়েছে এক মহা জ্বালা। মন ভাল থাকলে বলত, মুখার্জি। আর মেজাজ বিগড়ে গেলে বলত, ব্ল্যাকি।

তার রাঁধুনী ছিল রোজি। রোজি তো শুনে হেসে বলত, ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি যে করছ, মিস্টার মুখার্জি কি সত্যিই ব্ল্যাক? আমি তো দেখি রীতিমত ফেয়ার।

এর উত্তরে মুখঝামটা দিয়ে প্রৌঢ়া যা বলত, তা আমাদের গ্রাম্য মুখরা মাসী-পিসীদের নিজস্ব ভাষার ঢঙে সাজালে এই দাঁড়ায়—আ মল যা! তোর অত দরদ কিসের লো ছুঁড়ি? জোয়ান পুরুষমানুষ দেখেছে অমনি ঘাড় মটকাবার তালে ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছে!

তখন তেমন অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেনি দুজনের মধ্যে, তাই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি মিসেস পার্কারের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল রোজি।

সেদিনের মত সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বুড়ীর ওই অসতর্ক কথাটা যেন তার মনের মধ্যে তীরের মত বিঁধে গিয়েছিল। এক এক ধরনের কথা হয় সংসারে, যা উচ্চারিত হয় অত্যন্ত সহজে ; কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা হয়—তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় তা মারাত্মক। রোজিরও হয়েছিল তাই। নিদারুণ প্রতিক্রিয়া। সে ভাবত, আমি কি সত্যিই একজনকে বিপথে টেনে নেবার তপস্যা করছি, আমি রাঁধুনীর কাজ করি বলে কি বিপথগামিনী মেয়ে ? ছি-ছি !

কিন্তু, কী হবে আর ভেবে সেই সব পুরনো কথা ? প্রৌঢ়া আজও বেঁচে আছে কি না কে জানে ! আর সেই 'রোজি' অর্থাৎ 'সুজাতা' ? তার কথাও আজ থাক্।

সোমা কিন্তু কোন কথা বলে নি। কিছু জিজ্ঞাসাও করে নি। ওঁদের ইচ্ছামত ট্রেনে উঠে বসল পরদিন একটা রিজার্ভ-করা প্রথম শ্রেণীর কামরাতে। রওনা হবার দিন নেলীও বলে নি আর কিছু, গৌতমও না। সারাটা দিন ধরে ওরা জিনিসপত্র গুছিয়েছে, এটা-ওটা করেছে। লগেজও বহু। সঙ্গে যাচ্ছে রামস্বামী। সে কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসবে। অ্যাটেণ্ডটেণ্ট কামরায় সে থাকবে, দেখাশোনা করবে সে ওঁদের। বহু লোক এসেছিলেন স্টেশনে, সে এক রীতিমত সমারোহ। ট্রেন বেশ লেট ছিল, ছাড়তে-ছাড়তে প্রায় সন্ধ্যা।

জানলার বাইরে মুখ করে বসে ছিল সোমা। বাসন্তী রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। তাঁরই মেয়ে, কিন্তু আপন বলে ভাবতে পারছে কি তাঁকে এতক্ষণে ?

ব্যাকুল আগ্রহে সে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এ-দেশের প্রতিটি লতাপাতাও যেন তার পিপাসিত মন দিয়ে সে গ্রহণ করতে চায়।

কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, ওর মুখখানা বোধ হয় মিলির মত। এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে,

'মত' নয়, একেবারে 'মিলি'—হুবহু মিলির মুখখানা। সেইরকম নাক চোখ চিবুক আর কপাল। ওর বয়স পঁচিশ হবে, কিন্তু দেখায় যেন আরও ছোট, আরও কচি।

কলকাতায় বউদিরা মিলিকে দেখে বলত, মেয়ে সুখী হবে। বাপ-মুখী মেয়ে যে!

ওঁর মুখের আদল কি মিলির মত সোমাও পেয়েছে? চোখের তারা দুটি কিন্তু খুব কালো, ভ্রূ দুটিও সুগঠিত। শাড়ি-পরা অবস্থায় ওকে দেখে ভাবা শক্ত যে, ও ইয়োরোপীয়ান মায়ের মেয়ে। এক কেবল গায়ের রঙটা ওর মায়ের মতই ধবধবে ফরসা।

ওর মা সুজাতা এইরকম চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণীই ছিল সেদিন। এইরকম তন্বী। যাকে বলে, ব্রুনেৎ। অত্যন্ত সাদাসিধে। রাঁধুনীর কাজ করে, কিন্তু ওদিকে কলেজে পড়ে। উচ্চশিক্ষার দিকে ঝোঁক। কিন্তু সেটা কি সহজেই জানতে পেরেছিলেন তিনি?

সকালে চা নিয়ে আসে, ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে, প্রতিদিনই দেখা হয়। আর সুযোগ বুঝে ওর সঙ্গে আবোলতাবোল গল্প করে। কথ্য ইংরাজীটা অভ্যাস করে নেন মুখার্জি। কত বিষয়ের অবতারণা করেন, মেয়েটি 'হুঁ' 'হাঁ' করে সাড়া দেয়। আর মিসেস্ পার্কারের সাড়া পেলে ভীরু বালিকার মতই সরে যায়। সাধারণ রাঁধুনী-শ্রেণীর মেয়ে, কীই বা ওর জ্ঞানগম্যি! ওর সম্বন্ধে প্রথম প্রথম একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই ছিল। তাই যেদিন এক বাসস্টপে দাঁড়িয়ে হঠাৎই লক্ষ্য করলেন ওঁকে একমনে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে'র এক বিশেষ সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধ নিমগ্নচিত্তে পড়তে, সেদিন সত্যি সত্যি চমকে গিয়েছিলেন। পরদিন বলেওছিলেন কথাটা। মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বলেছিল, অনাথা মেয়ে। বাপ মহাযুদ্ধের সৈনিক, মারা গেছেন। মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে গেছেন। একা একা করি কী? পেট চালাই আর পড়াশুনা করার চেষ্টা করি।

—কী পড়?

—ভারতীয় ভাষা আমার স্পেশাল সাবজেক্ট।

এরও দিন দুয়েক পরে। মুখার্জী বলেছিলেন, তোমার কোনও উপকার করতে পারি রোজি?

মুখ তুলে বলেছিল, পারেন।

—কী?

—আমাকে বাংলাভাষা শেখাবেন?

—বাংলাভাষা!

—হ্যাঁ।

—কেন?

—এমনি।

বলে সেদিন আর দাঁড়ায় নি, মুখ ফিরিয়ে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন। মুখার্জী বলেছিলেন, শেখাব।

—এখানে নয়।

—তবে?

—আমার বাড়িতে। প্রতি সন্ধ্যায়, এক ঘণ্টা করে।

রোজির বাড়ি মানে বস্তি বললেই চলে। অনেক লোক একটা বাড়িতে। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। একটি মাত্র ঘর নিয়ে রোজি থাকে।

রোজির সেই ঘর। কত ছুটির দিন কত গল্প করেই না কেটেছে! ওর এক বান্ধবী ছিল, রোগা মতন। কী যেন নাম ছিল? হ্যাঁ, ম্যাগি। সেও আসত মাঝে মাঝে গল্প করতে। একদিন কিসের মাংস নিয়ে এল কিনে। বললে, দু দিনের খাবার হল।

—কিসের মাংস ম্যাগি?

একটু হেসে বললে, হেয়ার-পিগ।

—হেয়ার-পিগ! হেয়ার-পিগ মানে?

ও চলে যেতে রোজি বললে, শীতের দেশ, মাংস না খেলে

চলে না। গরিবেরা খরগোশের মাংস খেতে পায় না, শূয়রের মাংসও খেতে পায় না, ওরা অল্প-স্বল্প যা খেতে পায়, তা হচ্ছে 'খরগ্রোস-শূয়র'—হেয়ার-পিগ।

—কিন্তু মানেটা কী হল?

বললে, আসলে ওটা কিসের মাংস জান? বেড়ালের মাংস। কিন্তু তা কি মুখ ফুটে বলা যায়? তাই ওরা নাম দিয়েছে, হেয়ার-পিগ। এইরকম আরও আছে। ঘোড়ার মাংসও খেতে হয়, মুখে বলতে হয়—র‍্যাস্! কী, ঘেন্না পাচ্ছে তো? ঘেন্না, যারা খায় তাদেরও হয়। কিন্তু উপায় নেই। এই শীতে শরীর রাখতে হবে তো? অবাক হবেন না, গরিব এদেশেও আছে, এবং তাদের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়।

একদিন নয়, দিনের পর দিন ধরে রোজিকে আবিষ্কার করেছিলেন মুখার্জি। চিঠি লিখে-লিখে দেশ থেকে বাংলা বই আনিয়েছিলেন, আর কী আগ্রহে সেসব যে সে পড়বার চেষ্টা করত, তা বলবার নয়। তার তখনকার প্রিয় বই ছিল,—বিশ্বকবির 'গীতাঞ্জলি', বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', আর জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত'। বার বার বই তিনটি পড়ত, আর অর্থ বোঝবার চেষ্টা করত। তাঁকে এক-একদিন বলত, আমি যেন নবজন্ম লাভ করেছি।

—কী রকম?

বলত, কী মনে হয় জানেন? যাকে আমরা সচরাচর 'দেশ' বলি, সে-রকম 'দেশ'টা বড় কথা নয়। আমাদের আসল দেশটা মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। মনের মধ্যে তার নিজস্ব রূপ নিয়ে এক-একজনের গড়ে ওঠে এক-একটা দেশ। আমি যেন সেই দেশের সন্ধান পেয়েছি।

উনি বলতেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তোমার অত কথা আমি বুঝব না। আমি বুঝেছি অন্য এক কথা।

—কী?

সোজাসুজি বলতে পারেন নি কথাটা। রোজি কিন্তু বুদ্ধিমতী, ওঁর মন বুঝতে তার দেরি হয় নি সেদিন মোটেই। নত মুখে, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, মিসেস পার্কারের সন্দেহই বুঝি সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বাস কর তুমি,—আমি ল্যাণ্ডলেডির ভাষায় তোমার 'ঘাড় মটকাতে' চাই নি, আমি যা করেছি তা অন্তরের তাগিদে। আমার মন বহুদিন থেকেই তোমাকে চেয়েছে। নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেই সেদিন অবাক হয়ে গেছি। তারপর মনে মনে বলেছি—আরও জানতে হবে তোমাকে। তোমাকে জানতে হলে তোমার দেশকে জানা দরকার, তোমার ভাষাও জানা দরকার। জানতে গিয়ে আজ আমার মন ভরপুর হয়ে গেছে।

বলতে বলতে চোখে ওর জল এসে গিয়েছিল।

সেদিন সর্বপ্রথম ওর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন মুখার্জি, কিছু বলেন নি। সেও বাধা দেয় নি।

এর অনেক পরে, যেদিন প্রথম উনি ওর নাম দিয়েছিলেন—সুজাতা, সেদিনও ওই রকম চোখের জলের মধ্য দিয়ে ও তাকে বলেছিল—নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছিলাম, কিন্তু জিততে পারি নি। প্রেম এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি, এ যখন আসে ঝড়ের মত আসে, বন্যার মত আসে, একে কোন বুদ্ধি দিয়ে, কোন সংস্কার দিয়েই বুঝি প্রতিরোধ করা যায় না।

তিন

কী-এক বড় স্টেশনে এসে গাড়ি থামল এবার। চমক ভাঙল রামস্বামীর কণ্ঠস্বরেঃ খানা রেডি সাব।

নিশ্চুপে তুজনে বসে রাতের খাওয়াও শেষ করলেন, রামস্বামী বাসন-কোশন নিয়ে চলে গেল। ট্রেনও ছেড়ে দিল। মুখার্জি বললেন, এইবার শুয়ে পড়, কেমন ?

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সোমা, তারপরে একটু অনুনয়ের সুরেই বললে, আর-একটু দেখি।

সস্নেহে বললেন, দেখতে ভাল লাগছে বুঝি খুব ?

মাথা নেড়ে মেয়ে জানাল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পরে।

—শোন।

সোমা চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল ওঁর দিকে।

—তোমার মা এখন যেন কোথায়, বলেছিলে ?

—লণ্ডনে।

—কী করছে ?

—ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল খুলেছেন।

—তুমি চিঠি দাও নি ?

—কলকাতায় পৌঁছে, তারপরে দেব।

—ও।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্য।

—শোন। তোমার মায়ের ঠিকানাটা—না থাক্, তুমি চিঠিতে লিখে দিয়ো আমার কথা। লিখো, আমি ভাল আছি।

মাথাটা কাত করে মেয়ে জানাল, আচ্ছা।

মুখার্জি বললেন, তুমি যে আজ কলকাতায় যাবে, ভাবতে পেরেছিলে ?

মৃদুকণ্ঠে মেয়ে বললে, হ্যাঁ। কলকাতায় আমায় যেতে হতই।

একটু আশ্চর্য হয়েই বলে উঠলেন মুখার্জি, আমি যে রিটায়ার করছি, তোমরা জানতে ?

—না।

—তবে কলকাতা যাবার কথা ভাবলে কেমন করে ?

মেয়ে মুখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামাল, বললে, একটা থাকার জায়গা তো আমাকে ঠিক করতে হবেই। ইণ্ডিয়া হাউসে আমার অনেক জানাশোনা ছিল। একজনের চিঠি এনেছি কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুকে দেবার জন্যে। তিনি একটা জায়গা ঠিক করে দেবেন।

কার চিঠি! কিন্তু, সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। স্থাণুর মত নিশ্চল নিথর বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললেন মুখার্জি, তুমি ভাইজাগ পোর্টে নামলে, সে কি মাত্র আমাকে দেখবার জন্য ?

—হ্যাঁ। আর মায়ের ওই চিঠিটা—

—ও।

আর কিছু বললেন না তিনি। বলতে পারলেন না। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব-কিছু! কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে সব-কিছু। জোর করে দুটি চোখ বুজে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন তাঁর বার্থটার দেয়ালে। তাও তো বটে। ও থাকতে আসে নি তার কাছে। ও যেন অন্য জগতের অন্য এক মেয়ে। ও তার মিলি নয়। ও নয় সেই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি, যে তার শাড়ির আঁচলটা সামলাতে সামলাতে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে, গলাটা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

চোখের কোণ দুটি বুঝি ভিজে উঠেছে। প্রাণপণে চোখ দুটি বুজে রইলেন তিনি, চোখ ছাপিয়ে জলবিন্দু যেন না গড়িয়ে পড়ে!

তা হলে সত্যি? সত্যিই তাঁর কাছে থাকতে আসে নি মেয়ে? ওর মায়ের চিঠিটা মনে পড়ল: তোমার সংসারে ও অশান্তির ঝড় তুলতে চায় না।

কিন্তু, এ যদি তিনি না হতে দেন? যদি তিনি বলেন, তোমাকে যেতে দেব না, আমার কাছেই থাকবে তুমি? মেয়ে কি তাঁর কথা রাখবে?

যদি না রাখে! কারুর উপর কোনদিন জোর করেন নি তিনি। সেই পঁচিশ বছর আগে সুজাতা যেদিন তাঁর কোনও কথা কোনও অনুনয়ই শুনল না, সেদিন থেকেই তাঁর মন তাঁর অজ্ঞাতসারে অন্যপথ ধরেছে। কোনও কিছুর ওপর কোনও দাবি করা, কারুর উপর কোনও জোর করা, জিদ ধরে কোন-কিছু করতে যাওয়া—মনের এই স্বাভাবিক স্রোতোধারা কোন্ নিষ্করুণ মরুপথে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন বুঝি শুকিয়ে গেছে!

গ্লাসগোর পর জাহাজের চাকরি। সাত বছর সে চাকরির পর পাইলটিং সার্ভিসে যোগ দিয়ে দেশে ফিরলেন, বয়স তখন তাঁর সাঁইত্রিশ। বাবা তখন বেঁচে। বললেন, বিয়ে কর।

মা নেই। দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত অচিরেই তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন বাবা, মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারেন নি তিনি, কোনও প্রতিবাদও করেন নি। বড়দা পণ্ডিত মানুষ, সারা জীবন সরকারী কলেজের অধ্যাপনা করে অবশেষে গিরিডিতে বাসা করে বৃদ্ধবয়সে অবসর যাপন করছেন। দুটি তাঁর ছেলে। দুটিই কৃতী, সরকারী চাকুরে, দিল্লির বাসিন্দা। একটি মেয়ে তাঁর, তারও খুব ভাল বিয়ে হয়েছে কলকাতাতেই কোথায় যেন। বড়দা অবশ্য পড়ানোর কাজ থেকে অবসর নিলেও কাজ ওঁকে ছাড়ে নি, বাড়ি [illegible] আজও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। কত কী পড়েন, কত কী [illegible]রেন। বুদ্ধদেব আর বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তাঁর তো বিরাট

এক গবেষণা-গ্রন্থ রয়েছে। একবার ছুটিতে গিরিডিতে গিয়েছিলেন মুখার্জি। বড়দা বললেন, সুধীর, তুই এক কাজ কর্। পালি পড়্। প্রাচীন এক পালিগ্রন্থে সেকালের নেভিগেশন সম্পর্কে অনেক খবরাখবর আছে। তোর পড়তে খুব ইনটারেস্টিং লাগবে।

আর একবার। ভাইজাগে। গৌতম সবে কোলে এসেছে ওর মায়ের। বড়দা সংবাদ পেয়ে কী খেয়ালে একেবারে টেলিগ্রামই পাঠিয়ে বসলেন, 'সুধীর, তোর ছেলেটির নাম রাখলাম—গৌতম।'

সেই থেকে ওর নাম গৌতমই রয়ে গেল। নেলী ও নেলীর মার অজস্র খুঁতখুঁতিতেও সে নাম মুছে গেল না। বড়দার ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে ততটা নয়, যতটা ওঁর দুই ছেলের সরকারী পদমর্যাদার জোরে। মিসেস বাতাসিরিয়া অর্থাৎ নেলীর মা নিজে দিল্লির বাসিন্দা হয়ে তা পরিহার করেন কী করে?

মেজদা কিন্তু সাহেব মানুষ। ঠিক বাবার মত হয়েছে মেজদা। রায়বাহাদুর বাপের উপযুক্ত ছেলে। দীর্ঘদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে অর্থ-দপ্তরের কোন উচ্চপদে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজকার্য চালিয়ে আজ অবসরপ্রাপ্তির পরও কোন বিরাট ফার্মের যেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, না কী হয়েছেন যেন! মেজদার ছেলে নেই, দুটি মেয়ে। চারটি বুঝি হয়েছিল, মাঝের দুটি নেই। বড় আর ছোট। বড়টির বিয়ে হয়েছে খুবই ভাল। জামাইটি অবস্থাপন্ন, সরকারী বড় অফিসার—কলকাতাতেই। ছোটটি সুমনা, সোমারই বয়সী, কিংবা দু-এক বছরের ছোট হবে হয়তো, পড়াশুনা শেষ করেছে, এখনও বিয়ে হয় নি।

কলকাতায় পৌঁছে কোনরকমে বাড়ির একটু বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়েই মুখার্জি ছুটলেন মেজদার বাড়ি সেই ওল্ড বালিগঞ্জে, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সুমনাকে। বললেন, আয়, তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

বাড়িটা কিন্তু পুরো তৈরি হয় নি, কোথাও-কোথাও মিস্ত্রীরা তখনও কাজ করছে। আলিপুরের একেবারে এক [illegible]।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ক্যানেল, ক্যানেলের পরই সারি সারি রেল লাইন, কলকাতা-বজবজের গাড়ি যায় আসে, তার ওপারে আবার সব বাড়ি, নতুন-নতুন নানান ফ্যাশানের। অনেক হয়েছে, আরও হচ্ছে। ওটাও নাকি আলিপুর। নিউ আলিপুর।

প্রথম পরিচয়ের সমস্ত জড়তা কেটে যাবার পর, জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ডেকের মত দোতলার যে বারান্দাটা, সেইখানে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সোমা প্রশ্ন করল সুমনাকে, নিউ আলিপুর কেন? 'নতুন আলিপুর'ও তো নাম দিতে পারত?

সুমনা হেসে বললে, ইংরেজী-বাংলায় মিশিয়ে নাম হয়েছে বলে আপত্তি করছ? নিজে ইংরেজী-বাংলায় মেশানো মানুষটি হয়েও?

কিসের লজ্জায় উচ্ছ্বাসে যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল সোমার মুখখানা।

সুমনা বললে, তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব রইল, বুঝলে? আশ্চর্য সুন্দর মানুষ কিন্তু তুমি। রাস্তায় হাঁটতে বেরুলে, লোকজনদের পথচলা বন্ধ হয়ে যাবে।

—কেন!

—তারা তোমায় দেখবে, না, হাঁটবে?

আরও লজ্জা পেয়ে মুখখানা নিচু করল সোমা। তারপরে একসময় মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—মাত্র একটা? একশোটা নয়?

হেসে ফেলল সোমা। তারপরে বললে, শোন, একটা ঠিকানা বলতে পার? ত্রিভলি পার্ক। বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। কোন্‌দিকে হবে সেটা?

সুমনা বললে, মার কাছে মাসীর গল্প করছ যে! ও তো আমাদের বাড়ির কাছেই! কত নম্বর ফ্ল্যাট বল তো?

—সে আমার কাছে লেখা আছে।

পাশের দরজার কাছে ওদের গলা শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন

মুখার্জি, ওদের অলক্ষ্যে ওদের সব কথা না শুনেও পারেন নি, কিন্তু আর পারলেন না শুনতে, দ্রুতপায়ে চুপি চুপি সরে এলেন ওদের কাছ থেকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। নব-নিযুক্ত বাবুর্চি-বেয়ারা আর আয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘোরাঘুরি করছে, রাজমিস্ত্রী-মজুররা আজকের মত চলে গেছে। পাশের বাড়ির মিস্টার সিনা, অ্যাডভোকেট এবং তাঁর বন্ধু, যিনি তাঁর এখানকার এই জমিটুকু কেনার মূলে ছিলেন, যিনি ঝি-চাকর ঠিক করা থেকে যাবতীয় কাজ নিজে থেকে করে রেখেছিলেন, তিনি এসে দেখা করে আবার চলেও গেলেন। ধীরে ধীরে সব অন্ধকার হয়ে গেল, কাছের সেই রাস্তার ধারের প্রকাণ্ড শিরীষগাছে কুলায় ফিরে আসা পাখিদের কলরবও হয়ে গেল শান্ত। তাঁর বাড়ির ডান দিকে রাস্তাটা বাড়ির পিছন থেকে শুরু করে পাশ দিয়ে দিয়ে সামনে এসে ক্যানেলটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর পথ না পেয়ে দুটি বাহু বিস্তার করেছে দুই দিকে, ডান দিকে মিস্টার সিনার বাড়ি ছুঁয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে; আর বাম বাহুটি তাঁর বাড়ির গেট পেরিয়ে বাড়ির এলাকা পর্যন্ত গেছে, আর রাস্তা নেই। অর্থাৎ, তাঁর বাড়ির ওই এলাকার একেবারে ও-প্রান্ত বলা চলে। তাঁর বাড়ির বাঁ পাশটি অন্য কোন অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, অন্য গলিপথ দিয়ে ঘুরে-টুরে যেতে হয় সম্ভবত। ভাল দেখা হয় নি, একতলা একটা ব্যারাকের মত পুরানো বাড়ি চোখে পড়ে, আর সব টিনের বাড়ি, ঘেঁষাঘেঁষি। ওইসব অঞ্চল থেকে উত্থিত নানান সুরের কোলাহল শোনা যায় মাঝে মাঝে। এখন এই মুহূর্তেও শোনা যাচ্ছে। ঠিক কী কী ধরনের লোকজন থাকে ওখানে কে জানে, সিনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

—কাকু!

নিজের চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ-ই যেন জেগে উঠলেন। দেখলেন, তাঁর ঘরের, তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুমনা আর সোমা।

সস্নেহে বললেন, আয়, ভিতরে আয়।

এল ওরা। সুমনা বললে, কাকু, আমি সোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কোথায়?

—কোথায় আবার? সুমনা বললে, আমাদের বাড়িতে।

—কেন!

সুমনা হাসল, কেন কী? মেয়েকে ছেড়ে থাকতে মন চায় না বুঝি? না না, কোনও কথা শুনব না। ও আমার কাছে গিয়ে থাকবে। এখানে কাকীমা নেই, কেউ নেই, তুমি তো থাকবে তোমার বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ও বেচারা একা একা এখানে করবে কী? আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে।

মুখ তুলে সোজা তাকালেন ওদের দিকে, তারপরে বললেন, তার চেয়ে তুই এখানে এসে থাক্ না।

—তাই কি হয় নাকি? সুমনা বললে, মার অসুবিধা হবে না! আজকাল ঘরের কত কাজ করি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে, তা জান?

বলেই ওঁর আরও কাছে সরে এসে সুর নামিয়ে বললে, বেশীদিন নয় কাকু। মাত্র তিন দিন। তিন দিন পরে তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তুমি কিন্তু রোজই যাবে আমাদের বাড়ি। রোজই খাবে।

হেসে ফেললেন মুখার্জি, তারপরে বললেন, আচ্ছা, যা। সোমার মত আছে তো? কী বল সোমা?

সোমা আজ একটু হেসে মাথা নিচু করল। সুমনা বললে তা ছাড়া, তোমার বাড়িটাড়ি এর মধ্যে গুছিয়ে তোল। ও নতুন এসেছে, ওর অসুবিধাও তো হতে পারে। কী বল?

—তা বটে।

—তা হলে ওকে নিয়ে যাই! ওর সুটকেস এখানেই রইল।

—ওর কাপড়-চোপড়?

সুমনা মুখ ঘুরিয়ে বলল, সে সব তোমায় ভাবতে হবে না।

বাপের মত মেয়েও ঠিক ওই কথা বলছিল। ঠিক যেন পরের বাড়ি যাচ্ছে! সেখানে যেন কিছু পাওয়া যায় না; সেখানে যেন কিছু নেই।

তারপরে সোমার দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, দাঁড়াও না, মার কাছে গিয়ে আগে মীমাংসা হোক—কে বড়, আমি, না, তুমি। তারপরে দেখা যাবে, শাসন কাকে বলে?

বেশ লাগছিল ওর এই অন্তরঙ্গ কথা বলার সুর। একটু হেসে মুখার্জি বললেন,—ওই বড় হবে বোধ হয়।

—ইস্, ঠোঁট উলটে সুমনা বললে, এই যে দাঁড়িয়েছি। কাকে বড় দেখায় বল তো? আমাকেই। তুমি দেখ, আমাকেই ওর দিদি বলতে হবে। চলি তা হলে?

দাঁড়া ট্যাক্সি আনিয়ে দিই।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোমা সত্যিই চলে গেল সুমনার সঙ্গে। তিন দিন থাকবে। তা থাকুক তিন দিন ওখানে। এক দিক থেকে বড় নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। সুমনার কথায় যা বোঝা গেল, সোমা যে চলে যাবে, তার বাবার কাছে সে যে থাকবে না, সে কথাটা সুমনাকে সে জানায় নি। বুদ্ধিমতীই মনে হচ্ছে ওকে। কিন্তু তিন দিন পরে ফিরে এসে, যদি দু-একদিন পরেই সে চলে যেতে চায়? কী হবে তা হলে?

কী আবার হবে! কারুর কিছু হবে না। রোজ যেমন সূর্য ওঠে তেমনি উঠবে, দিন হবে, রাত আসবে। শুধু, নিজের মনটাকে শক্ত করতে হবে। সত্যিই তো, যা অপ্রতিরোধ্য, তাকে ঠেকানো যায় কি? কখনও যায় নি, আজও যাবে না। যা ঘটবার ঠিক তা ঘটবে।

রামস্বামী বোধ হয় চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। তাঁর অভ্যস্ত দ্বিতীয়বারের চা।

—রামস্বামী!

—জী সাব ?

—তুই তো কালই চলে যাচ্ছিস, না ?

—জী।

—যা চলে, মাকে বলিস আমরা ভালই আছি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এল। কিন্তু রাতটা যেন আর কাটতে চায় না। কত কী টুকিটাকি কাজ করার ছিল, কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না। সিনা আবার এসে কিছুক্ষণ গল্প করে গেল, সঙ্গে ওর স্ত্রীও ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই যেন মনঃসংযোগ করতে পারছেন না তিনি। ওদের কথার পিঠে 'হুঁ' 'হাঁ' করে গেছেন শুধু। সিনা বললে, তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম কর।

মিসেস সিনা বললেন, কোনও অসুবিধা হলে বলবেন।

চলে গেল ওরা। সিনা তার ছেলেবেলাকার বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী। দেখাসাক্ষাৎ বহুদিন ছিল না, চিঠিপত্রে কিন্তু নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গেছে সে। তাঁর জন্য জমি কিনে রাখা, তারপর সুযোগ বুঝে একদিন বাড়ির প্ল্যান অনুমোদন করিয়ে নেওয়া, ক্রমশ, ঠিকাদার রেখে বাড়ির কাজ শুরু করে দেওয়া। বন্ধু সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু একেও তো কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারেন নি সুজাতার কথা! আজ ওরা এটুকু জেনেছে, সোমা তারই মেয়ে। অথচ কোন্ মায়ের মেয়ে, সে কথা ওরা জিজ্ঞাসা করছে না। এমন কি, সুমনাকে বলে ফেলা সত্ত্বেও সে আর কি প্রশ্ন করল না। এ যেন তার কাছে কোন বিশেষ ঘটনাই নয়।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা এ। তার চেয়ে ওরা প্রশ্ন করুক, চারিদিক থেকে এসে তীব্রকণ্ঠে ওরা কোলাহল তুলুক, হিংস্র ভঙ্গিমায় দাবি জানাক, কেন তুমি জানাও নি এ খবর? কেন অমন করে ফেলে রেখে এসেছিলে সুজাতাকে ?

কেন—কেন—কেন!

বড় একা—বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে আজ। কত রাত এখন কে জানে! খাওয়াদাওয়া করে বাবুর্চি-বেয়ারা-রামস্বামীও শুয়ে

পড়েছে বহুক্ষণ। নীরব, নিষুতি হয়ে গেছে চারিদিক। পাশের সেই বস্তি-মতন ঘরগুলি থেকেও কোন কলরব শোনা যাচ্ছে না, একটিমাত্র কণ্ঠস্বরও নয়।

ঢেউ—ঢেউ আর ঢেউ! ঝড় উঠেছে সমুদ্রে। সেই বিক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে তার ক্ষুদ্র পাইলট-বোটটি চলেছে, সেই-রকম বসে আছেন তিনি চেয়ারটিতে, তেমনি রামলু সারেঙ হুইল ঘোরাচ্ছে। কিন্তু কোথায় জাহাজ? কাকে হাত ধরে বন্দরে নিয়ে যাবার জন্য তিনি বার হয়েছেন! কেউ নেই—কিছু নেই—দিক্‌চক্রবালে একটি বিন্দুও দৃশ্যমান হচ্ছে না, সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নিঃসীম শূন্যতা।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। ইস্! বেলা হয়ে গেছে বেশ! কিন্তু এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে-দেওয়া। বেয়ারা এসে বোধ হয় জানলাগুলোর পর্দা সরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, একমাত্র তার শিয়রেরটা ছাড়া। আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন-রঙ-করা মেঝের ওপর। নতুন তো সবই, এই ঘরের চারটে দেয়ালই নতুন। পাশের বস্তি-মতন বাড়িটা থেকে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। একটা কথাও বোঝা যায় না।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকতেই চোখ পড়ল টিপয়ের ওপর। চা-জলখাবারের ট্রে-টা নামানো, আর তার একটু দূরে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রামস্বামী নয়, নতুন বেয়ারাও নয়, আয়াটিও নয়, কে ও?

মুখ ফেরাল সে।

অতর্কিত বিস্ময়ে মুহূর্তকালের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন মুখার্জি। তারপরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, সোমা!

—হ্যাঁ।

—ওখান থেকে চলে এলে যে ?

জানলার কাছ থেকে সরে এল সোমা, মুখখানা নিচু করে ট্রের দিকে হাত বাড়াল, বোধ হয় নিজের হাতে চা তৈরি করে দিতে চায়। ধীর কণ্ঠে বললে, আপনি বসুন।

বসলেন মুখার্জি। বললেন, ওখানে তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো ?

—না বাবা। তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, জ্যেঠামশাই কত খুশী হলেন, জ্যেঠাইমা কত আদর করলেন, আর তা ছাড়া সুমনার তো কথাই নেই। ভারি সুন্দর মেয়ে !

ভাল করে চেয়ে দেখলেন, দামী গোলাপী রঙের একটা শাড়ি পরনে, হাত আর নিরাভরণ নয়, দুগাছা করে চুড়ি পরা, গলায় ওর নিজের সেই সরু হারের ওপর একটা নেকলেস ঝলমল করছে !

ওঁর দিকে চা এগিয়ে দিয়ে সোমা বললে, সুমনা নিজেরগুলো সব পরিয়ে দিয়েছে আমাকে।

চমৎকার লাগছে ওকে, সুমনার কথা শুনে ওর প্রতিও অদ্ভুত এক স্নেহ অনুভব করতে লাগলেন তিনি। নেলী না হয়ে যা করে নি, সুমনা অবলীলায় তাই করেছে। অবশ্য এ সব গয়না তো ফেরত দিতে হবেই। তার ওপরে যখনই সোমাকে তিনি কিনে দেবেন গয়নাপত্র, সুমনাকেও দেবেন, তার কাকুর স্নেহ-উপহার। কখনও তো দেন নি ওদের তেমন কিছু।

—কোথায় সে ? সুমনা ?

ওঁর মুখের দিকে তাকাল সোমা—সুমনা ? আর দাঁড়াল না, আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। আপনি তখনও ওঠেন নি।

—ও। তুমি বস। চা খাবে না ?

ওর সামনেয় চেয়ারটাতে বসল সোজা। মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি অনেক খেয়ে এসেছি বাবা। সেই অত ভোরে উঠে জ্যেঠাই-

মা কত কী খাবার আনিয়ে নিজের হাতে যত্ন করে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন।

মুখার্জি বলে উঠলেন, এত যত্ন পেয়েছ, তবু চলে এলে কেন ?

কী যেন বলতে গিয়ে চোখ দুটি ছলছল করে এল সোমার, নিরুত্তরে মুখখানা নিচু করল সে।

সোমা, একটা সত্যি কথা বলবে ?

একটু আশ্চর্য বোধ করেই মুখখানা তুলল, চোখে তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

মুখার্জি বললেন, তোমার মায়ের কথা উল্লেখ করে ওরা কি কিছু বলেছে ?

—না বাবা, না। সোমা বলে উঠল, মার কথা একেবারেই জিজ্ঞাসা করেন নি ওরা কেউ।

—তবে ?

বুদ্ধিমতী মেয়ে বোধ হয় বুঝতে পারছে প্রশ্নের তাৎপর্যটা, কিন্তু কিছু বলল না, আগের মত তেমনই বসে রইল নতমুখে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল সুকঠিন নীরবতার মধ্য দিয়ে। কী একটা সন্দেহ করে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, মেয়ের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর চিবুকে হাত দিয়ে জোর করে উঁচু করে ধরলেন মুখখানা, এ কী, কাঁদছ তুমি !

মুখটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে, তারপর একটু বোধ হয় নিজের আবেগটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

মেয়ে বললে, এই একটা মাস এখানে থাকব বাবা ?

—মানে ?

ততক্ষণে আরও একটু সহজ হয়ে এসেছে সে, বললে, মা তো এখানে আসবেন মাসখানেক পরে, না ?

—কার মা ?

একটু যেন বিব্রত বোধ করল সোমা, তারপরে একটু ইতস্তত করে বললে, আমার মা। আমার এখানকার মা।

কথাটার প্রতিধ্বনি করে উঠলেন মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ, তোমার এখানকার মা!

তারপরে, পায়চারি করতে করতে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলাটার কাছে। একটুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে, বসলেন। বললেন, তিনি আসবেন মাসখানেক পরেই বটে। কিন্তু তুমি ওসব কী ভাবছ?

ছুটি বড় বড় চোখ তুলে বড় করুণ দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকাল মেয়ে, তারপরে বলে উঠল, সুমনা নিয়ে গেল। কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না বাবা।

বলতে বলতে আবার তার অভ্যাসমত মুখখানা নিচু করল সে। কথা বলল, গলা তার কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, বললে, মনে হচ্ছিল, 'ওরা যা ভাবে ভাবুক, আমি তখ্খুনি ছুটে চলে আসি এখানে।

হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত তাড়াতাড়ি চেপে ধরলেন মুখার্জি, বললেন, তবু তুমি বলছ, তুমি এখানে থাকবে মাত্র একটি মাস!

—আমি তোমার অপরাধী বাবা, কিন্তু ক্ষমাও তো মানুষে করে। দয়াও তো মানুষের ধর্ম।

—আপনি অমন করে বলবেন না বাবা। উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাটা বলে ফেলে আর দাঁড়াতে পারল না। মেয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

চলে গেল রামস্বামী, রাজমিস্ত্রীরা কাজে এসে লাগল। আউট-হাউসগুলোই বাকি, আর বাকি বাড়ির চারধারের দেয়ালের কিছু অংশ। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখাই ঠিক করলেন মুখার্জি, চুপচাপ বসে থেকে কী লাভ!

তারপরে, বিকেল হতে না হতেই একটা ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লেন মুখার্জি সোমাকে নিয়ে। প্রথমে মেজদার বাড়ি। সুমনাকে তুলে নেওয়া। তারপরে গয়নার দোকান। সেখান

থেকে বাড়ি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুমনা বললে, আমায় ফিরতে হবে যে তাড়াতাড়ি।

মুখার্জি সস্নেহে বললেন, দুই বোনে তোদের গয়নাগাটি সব পরে আয় দেখি।

—তুমি কি সত্যিই আমাকে অত গয়না দিলে নাকি কাকু?

—হ্যাঁ রে। তোর আর ওর। দুজনের দুই সেট।

একটু পরেই এল দুজনে ওরা সাজসজ্জা করে। এসে প্রণাম করল। সুমনা বললে, এসব পরে একা আমি ফিরতে পারব না কিন্তু।

—চল্, আমি নিজেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সোমা একটু একলা থাক্।

—তা হলেই হয়েছে!

—কী হয়েছে?

সুমনা বললে, তুমি নেই, ও কেঁদে ফেলবে। আমাদের বাড়ি গিয়ে কাল লুকিয়ে লুকিয়ে সে কী কান্না! তোমাকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না।

মুখখানি ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে সোমার। লাল বেনারসী পরেছে, আর পরেছে চারগাছা করে চুড়ি, গলায় দামী হার। অপরূপ দেখাচ্ছিল ওকে।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরলেন তাড়াতাড়ি, বললেন, চল, আমরা দুজনে মিলেই ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসি।

সুমনা বললে, সেই ভাল।

পরদিন বহু কাজের ভিড়। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্ ট্রান্সফার-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু কাজ। সঙ্গে যে টাকা এনেছিলেন, সে তো প্রায় সবই গেল গয়নাগাটি কেনার ব্যাপারে। ভগবৎকৃপায় জীবনে আয় করেছেন প্রচুর, এবং খানিকটা হিসাব করে চলবার চেষ্টা করেছেন বলে সমগ্র অবসর-জীবনকালটা, আর যাই হোক,

প্রচণ্ড অভাবের মধ্য দিয়ে কাটবে না। ইন্সিওরেন্স, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, এসবও আছে। কিন্তু আপাতত সংসার-পরিচালনার কী হবে? দ্বিতীয়ত, মেয়ে এল, ওর ভবিষ্যৎও ভাবতে হবে। তবে কি মেজদার মত কোন প্রাইভেট ফার্মে তাঁকে চাকরি নিতে হবে নাকি? এইসব নানান চিন্তা, আর নানান ছুটোছুটির মধ্য দিয়ে কেমন করে যে কোথা দিয়ে সারাটা দিন কেটে গেল, তা টেরও পেলেন না। যখন অবসর পেলেন, তখন ক্লান্তিতে সারাটা শরীর ভরে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সোমা, তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। এ-ও এক নতুন স্বাদ। ওর হাসি-হাসি মুখখানা দেখে সব ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। কিন্তু, তখন অনেক বিস্ময় প্রত্যক্ষ করা বাকি। নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন মুখার্জি। এমন চমৎকার করে সাজাল কে ঘরখানা? এমন রুচিসম্মতভাবে? স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করানো—কাচের ঢাকায় রাখা সেই উপহার পাওয়া রূপোর টাগ্‌টাই তাঁর মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে দিল সব থেকে বেশী।

—বাঃ! এত কাজের মেয়ে তুমি! লজ্জায় মুখ নিচু করল মেয়ে।

—কিন্তু তুমি এখনি এত খাটতে গেলে কেন? কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে—

তাড়াতাড়ি বলে উঠল সোমা, আমি আর খাটলাম কোথায় বাবা? আয়া আর বেয়ারাই সব করেছে।

—সে তো বোঝাই যায়। মুখার্জি বললেন, চল দেখি, নিজের ঘরখানা কেমন গুছিয়েছ।

একেবারে পিছনের কোণার ঘরখানা বেছে নিয়েছে ও। জানলায় দরজায় সাধারণ পর্দা। ঘরে একটা খাট আর বিছানা। আর একটা টেবিল আর চেয়ার।

কোনও সমারোহ নেই, কোনও উজ্জ্বলতা নেই।

মেয়ে বললে, আসুন বাবা, মায়ের ঘরটা দেখুন, আর গৌতমের ঘরটা।

আগের বারে যখন ছুটিতে এসেছিলেন, তখনই আসবাবপত্র পছন্দ করে কেনার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিনা সবই আনিয়ে রেখেছিল যথাসময়ে।

ঘুরে ঘুরে সব-কিছু দেখে তারপর নিজের ঘরে এসে বসলেন।

বাড়ল রাত। খাওয়া-দাওয়াও একসময় হয়ে গেল।

—বাবা!

—কিছু বলবে সোমা?

—হ্যাঁ। কাল একবার সুমনার কাছে যাব?

—কেন? কোনও দরকার আছে? না, এমনিই দেখা করতে চাও?

সোমা একটুক্ষণ থেমে তারপর বললে, দরকার আছে বাবা। আমি তো কলকাতার কিছু চিনি না। ওকে নিয়ে একটু বেরুব।

বলতে গেলেন, শহর ঘুরতে চাও, সঙ্গে সুমনা কেন, আমিই তো আছি। আমিই না হয় বেরব তোমাকে নিয়ে। কিন্তু কেন যেন মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, বেশ।

সোমা তখনি অবশ্য উঠে পড়ল না, বসে রইল আরও কিছুক্ষণ।

—বাবা!

—কী মা?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবেই সোমা বললে, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আপনার কাছে রেখে দেবেন বাবা?

—টাকা, না, পাউণ্ড?

—না। টাকাই। ওখান থেকেই স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ওপরে ড্রাফ্‌ট্ করে এনেছি। আপনার অ্যাকাউন্টে বদল করে নেবেন?

—তা কেন? তুমি নিজের নামে অ্যাকাউণ্ট খুলতে পার।

—না না। আমি টাকা নিয়ে কী করব?

সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন মুখার্জি। তারপর বললেন, সে কথা পরে হবে। আগে বল তো কত টাকা ?

—খুব সামান্য। একেবারে কিছুই নয়।

—তবু ?

—ছ হাজার।

—কিন্তু কোথায় পেলে এ টাকা ? মা দিয়েছে ?

—না।

—তবে ?

সোমা মুখ নিচু করে বললে, আমি যে চাকরি করতাম বাবা। ইণ্ডিয়া হাউসে।

—চাকরি করতে! মুখার্জি কথাটা বলে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপরে বললেন, ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙিয়ে তোমার নামেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেব। যাও, আজ রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড় গিয়ে।

পরদিন।

—গিয়েছিলে সুমনার ওখানে ?

—হ্যাঁ।

—চিনে যেতে পারলে ?

—তা পারলাম।

—বেরলে ওকে নিয়ে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় কোথায় ঘুরলে ?

—ত্রিভলী পার্ক। ভদ্রলোকের নাম শ্রীবীরেশ্বর বোস। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ইণ্ডিয়া হাউসের এক পরিচিত ভদ্রলোকের যে চিঠিখানা এনেছিলাম, সেটি ওঁরই নামের।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালেন মুখার্জি। মেয়ে বললে, এ চিঠির কথা তো আপনাকে বলেছিলাম বাবা।

হ্যাঁ, তা বলেছিলে। দেখা হল ?

—না। তিনি বাইরে গেছেন। ওঁর ছেলে এসে আলাপ করলেন। বললেন, আমাদের বাড়িতে এসে আপনি থাকতে পারেন। আমি বললাম, থাকার ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাববেন না। থাকার জায়গা আমি পেয়ে গেছি। একজনের চিঠি নিয়ে এসেছি, তাই কর্তব্য হিসাবে দেখা করে গেলাম। ভদ্রলোক শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তারপর ?

—আমরা চলে এলাম বাবা। ভদ্রলোক ঠিকানা চেয়ে রাখলেন কিন্তু।

—কেন ?

—ওঁর বাবাকে বলবেন আর কী, আমার কথা।

তারও পরদিন।

—সোমা, এই নাও ব্যাঙ্কের ফর্ম। সই করে দিও। কাল তোমার অ্যাকাউণ্ট খুলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে।

কত কথাই তো হয়, কিন্তু যার নাম আশ্চর্যজনক ভাবে কথা-প্রসঙ্গে এসে পড়ে না, সে হচ্ছে সুজাতা। প্রতিদিন ঘুমবার আগে তার কথা মনে পড়ে, হয়তো মেয়েও বলতে চায় মায়ের কথা, কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছ থেকে বুঝি লুকিয়ে রাখতে চায় তাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কোথায় যে সব ভেসে গেল। গ্লাসগোর শহরতলীর সেই ঘরখানা। সুজাতার ঘরখানা। ওঁর দেখাদেখি ম্যাগিও বোধ হয় ওকে একদিন ডাকতে আরম্ভ করল, —সু-জা-টা !

ওঁরা দুজনে কত হাসাহাসি করেছেন সেদিন ম্যাগির ওই নাম ধরে ডাকার ধরন লক্ষ্য করে।

সেই নিভৃতক্ষুদ্র ঘরখানিতে বসে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন দুজনে, ভারতের আত্ম-সাধনাকে প্রতিফলিত করবেন জীবনে।

কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষার সোনালী দিনগুলি !

পরদিন ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের কাজ সব শেষ করে ফেলা গেল। মনের মধ্যে যেন গুঞ্জন করে উঠল, ছুটি—ছুটি—ছুটি ! মানসিক পরিশ্রমের মাঝখানে যেন এসে হঠাৎ লাগল একটুখানি ছুটির হাওয়া, খুশির হাওয়া।

—সোমা !

—কী বাবা ?

—চিঠি লিখেছ তোমার মাকে ?

—হ্যাঁ বাবা। রামস্বামীর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছি।

মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে। তারপর বললেন, ভাল করেছ। কিন্তু, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

মেয়েও বোধ হয় বুঝতে পারল কথাটা। মুখ নিচু করে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় বলে উঠল, লিখেছি বাবা কিন্তু আজও উত্তর আসে নি।

ধীর, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলেন মুখার্জি, আসবে। ব্যস্ত হয়ো না।

—না।

আর-কোন কথা হল না সুজাতাকে নিয়ে।

পরদিন।

কি-একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরলেন বিকেলের দিকে। ড্রয়িংরুমে বসে ছিল কে এক ভদ্রলোক। বয়সে তরুণ। সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। পরনে পরিচ্ছন্ন স্যুট। তাঁকে দেখে অভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি অভিজিৎ বোস। আমার বাবার নাম বীরেশ্বর বোস।

ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠলেন মুখার্জি, ঠিক চিনলাম না তো!

অভিজিৎ বললে মিস মুখার্জি চিনবেন। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে মিস্টার সিদ্ধান্ত আছেন, আমার বাবার খুব বন্ধু। তাঁরই চিঠি নিয়ে—

—ও, এইবার বুঝেছি। মুখার্জি বললেন, আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল সোমা। তা ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল। বড় খুশী হলাম পরিচিত হয়ে।

—আমিও কম খুশী নই। এমনি আসবেন মাঝে মাঝে।

—আসব।

—আচ্ছা, আজ তা হলে—

ছেলেটি তাড়াতাড়ি করজোড়ে বলল, নমস্কার নমস্কার।

তারপরে চলে গেল। ওপরে সোমা অপেক্ষা করেই ছিল ওঁর জন্য। মুখার্জি বললেন, ছেলেটিকে চা-টা খাইয়েছিলে তো সোমা?

—হ্যাঁ বাবা।

—আর একটুক্ষণ গল্প করলে না কেন? চুপচাপ একা বসেছিল।

মুখ নিচু করল সোমা। কোনও উত্তর দিল না।

খাওয়াদাওয়ার পর।

—হ্যাঁ মা, ইণ্ডিয়া হাউসের মিস্টার সিদ্ধান্ত কে?

—উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বড় ভাল লোক। ঠিক আপনার মত। আমাকে কত শিখিয়েছেন। গীতা-উপনিষদের কথা কত শুনেছি ওঁর মুখে।

—গীতা-উপনিষৎ। জান তুমি?

লজ্জিত হয়ে মেয়ে বললে, আমি কিছু জানি না বাবা। তবে মা খুব পড়েছেন।

মুখার্জি প্রায় আপন মনেই বলে উঠলেন, মিস্টার সিদ্ধান্ত— নামটা যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। পুরো নামটা কী বল তো?

সোমা উৎসাহিত হয়েই বললে, শ্রীরাজকুমার সিদ্ধান্ত। খুব

পণ্ডিত। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন লণ্ডনের দু-একটি পত্রিকায়।

—তাই হবে। মুখার্জি বললেন, ওঁর প্রবন্ধই হয়তো পড়েছি। ভদ্রলোকটিকে চিনি না, তবে নামটির সঙ্গে পরিচয় আছে বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে খুব স্নেহ করেন তো?

সোমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, খুব স্নেহ করেন বাবা। কত কী জানতে চেয়েছি, কখনও বিরক্ত হন নি, চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চুপ করে রইলেন মুখার্জি, তারপর একসময় হঠাৎই প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা, তোমার মাও কি তোমার মতন শাড়ি পরেন?

—বাড়িতে মাঝে মাঝে পরেন।

—লণ্ডনে তো বাড়ি বলেছিলে, না?

—হ্যাঁ।

—একাই থাকেন?

—না। অনেক ছেলেপিলে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুল করেছেন যে মা!

—তোমার ভাইবোনেরা সব কোথায় থাকেন?

—ভাইবোন!

কথাটা হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে মুখার্জির। ঠিক এ ভাবে এসব কথা ওর কাছে তোলার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না তাঁর। কিন্তু আর তো থেমে থাকার উপায় নেই, সে আরও বিশ্রী দেখাবে। বললেন, বলছি, তোমার সৎভাইবোনদের কথা!

—সৎভাইবোন!

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে বুঝতে সোমার মুখখানা প্রথমে লাল, তারপরে একেবারে সাদা হয়ে গেল। রাত্রের আলো-অন্ধকারে বাইরে থেকে ততটা বোঝা গেল না। কোনক্রমে নিজেকে সামলে

নিয়ে উঠে দাঁড়াল সোমা, ঘর ছাড়বার আগে একটি কথাই শুধু অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে গেল, আমার মা আজও মিসেস মুখার্জিই আছেন।

আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুখার্জি। মনে মনে কেমন যেন একবার বিশ্বাস হয়েছিল, সুজাতা বিয়ে করেছে। হয়তো রাজকুমার সিদ্ধান্তকেই। কিন্তু এ কী শুনলেন তিনি! এ কী হল! মনে হল, মুহূর্তে ঘরের সমস্ত আলো গেল নিবে। তাঁর দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে যেন কারা অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে নিয়ে চলেছে!

অন্ধকার—আরও অন্ধকার!

অপরিসীম আতঙ্কে আর্ত চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, কেউ এসে তখুনি তাঁর হাত ধরুক। তাঁকে বাঁচাক।

চার

ধীরে ধীরে একসময় চোখ খুললেন মুখার্জি। দেখলেন, শুয়ে আছেন তাঁর বিছানায়। দু পাশে বাবুর্চি বেয়ারা আয়া। বাবুর্চি মুসলমান নয়, উৎকলবাসী হিন্দু—কিন্তু সাহেব-ঘেঁষা বহু বাড়িতে কাজ করেছে, 'সাহেবী-খানা' প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত—তাই বলতে হয় বাবুর্চি। কিন্তু ওর মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, ছেলেবেলায় ওঁর মা যেমন তাঁদের রান্নার লোকটিকে ডাকতেন,—তেমনি ঠাকুর বলে ডাকলে কেমন হয়? 'ঠাকুর, লুচি ভাজ দেখি খানকয়েক, খোকন খাবে।'—ঠিক মায়ের গলা বহু যুগ পরে যেন শুনতে পেলেন কানের কাছে। মায়ের তিনি ছিলেন ছোট ছেলে, খোকন ছিল তাঁর নাম।

কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলেন সারা শরীরে, মাথার একটা পাশ যেন ব্যথায় একেবারে অবশ হয়ে আছে মনে হল। কে বসে তাঁর শিয়রের কাছে? অমন করে মুখখানি মুখের কাছে এনে কে তাকে ডাকছে, বাবা? কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে যেন চিনতে পারলেন সোমাকে। সোমাই তাকে আগ্রহের সঙ্গে ডাকছে, বাবা!

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন মুখার্জি, কী হয়েছিল আমার?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

—কেন?

তৎক্ষণাৎই কোন উত্তর এল না। নিজের প্রশ্ন নিজেরই কানে কেমন যেন বেসুরো শোনাল, অল্প একটু হেসে বললেন, ও কিছু নয়। বোধ হয়, আজ একটু বেশী খাটুনি গেছে, সেইজন্যই—

সোমা বললে, কাল একবার আপনি ডাক্তার দেখান বাবা। প্রেসারটা একবার দেখা দরকার।

—প্রেসার!

ম্লান একটু হাসলেন। সোমার কথায় মনে-মনে একটু অবাকও হলেন। তাঁর যে ব্লাডপ্রেসার আছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটারও খোঁজ রেখেছ। কার কাছ থেকে? নীলিমার সঙ্গে কতটুকু কথা আর হয়েছিল ওর? রামস্বামীর কাছ থেকে জেনে থাকবে তবে। রামস্বামী তাঁর সব জানত। দেশে তার স্ত্রীপুত্র, নইলে ওঁদের সঙ্গে কলকাতায় চিরতরে চলে আসতে সে দ্বিধা করত না।

ধীরে ধীরে বিছানার উপরে একসময় উঠে বসলেন মুখার্জি। বেয়ারারা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সিনার-নিয়োজিত লোকজন, আদবকায়দায় ওদের ত্রুটি হবে না।

—মাকে টেলিগ্রাম করব বাবা?

চমকে উঠলেন মুখার্জি, কাকে? সুজাতাকে?

একেবারে অতর্কিত প্রশ্ন বলা যায়। মেয়ে মুখ নিচু করল, তারপরে প্রায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, তিনি আসবেন না। আমি বলছিলাম এখানকার মায়ের কথা।

উত্তর দিলেন না মুখার্জি। সোমাও বলল না কোনও কথা। দুজনে চুপচাপ বসে রইল কাছাকাছি, মুখ নিচু করে, যেন কিছু আর বলার নেই, কিছু আর শোনার নেই।

কিন্তু চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই করতে হল না, পরদিন হঠাৎই নীলিমা এসে উপস্থিত, সঙ্গে রামস্বামী। বেলা মধ্যাহ্নের কাছাকাছি। এ-ঘর সে-ঘর একবার ঘুরে এসে ওঁর কাছের চেয়ারটায় বসল নীলিমা। বলল, ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, গিয়ে অথৈ জলে পড়ব। নতুন বাড়ি, জিনিসপত্রও আছে কি নেই—সব গোছ-গাছ করে তুলতে একটা সপ্তাহই বুঝি কাটবে। কিন্তু এসে দেখছি, সংসারটি তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছ তোমরা!

—প্রশংসা করছ তো?

নীলিমার মুখে বিচিত্র হাসি। বলল, নিশ্চয়ই। বাপ মেয়ে—তুজনেরই প্রশংসা করছি। ফার্নিচারগুলো ভালই কেনা হয়েছে। কার টেস্ট কাজ করেছে বেশী? বাপ, না মেয়ের?

মুখার্জি একটু হেসে বললেন, সিনার। সব তারই কেনা। বন্ধুপ্রীতি কাকে বলে, একবার চোখ মেলে দেখ।

সত্যিই অবাক হল নীলিমা। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, এ ফ্রেণ্ড ইন্‌ডিড! মিস্টার সিনা না উঠে-পড়ে লাগলে তোমার জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর কিছুই হত না!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নীলিমা, বলল, যাই, একবার দেখা করে আসি।

—তা বলে এখুনি? বস। জিরিয়ে নাও।

—আমি কি দূরে কোথাও যাচ্ছি নাকি? এই তো পাশের বাড়ি বলতে গেলে। আর তা ছাড়া, আমি মোটেই টায়ার্ড ফিল্ করছি না।

—বেশ তো, না হয় একটু পরেই যেও'খন।

—না, এখুনি যাই।—নীলিমা উৎসাহে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে: 'থ্যাঙ্কস্' দিয়ে আসব। মালবিকা কেমন আছে?

মালবিকা সিনার স্ত্রীর নাম। মুখার্জি বললেন, ভালই আছেন। অনলও ভাল আছে।

—অনল!

একটু হাসলেন মুখার্জি, বললেন, সিনাকে 'সিনা' 'সিনা' করে ডাকতে ডাকতে ওর আসল নামটা আমরা ভুলে যাই। ওর আসল নাম, অনলকুমার। স্কুলে সংস্কৃতের মাস্টারমশাই ওকে ঠাট্টা করে ডাকতেন—

বাধা দিয়ে নীলিমা বলে উঠল, থাক্ ওসব ঠাট্টার কথা। আমি চললাম। যাব আর আসব।

ত্বরিতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল নীলিমা। ওর অপস্রিয়মাণ মূর্তিটির দিকে তাকাতে তাকাতে একটু অবাকই

হচ্ছিলেন মুখার্জি মনে মনে। অনল সিংহ তাঁর বাল্যবন্ধু, কিন্তু নীলিমার কোনও দিনই কোন আগ্রহ ছিল না ওদের প্রতি। ওরা যে জমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, বাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এসব ব্যাপারে মানুষের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, কিন্তু নীলিমা যেন কেন তেমন সন্তুষ্ট ছিল না ওদের উপরে! ওর ভাব দেখে মনে হত, সিনা যেন ওর অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করছে। প্রত্যক্ষে কোন বাধা অবশ্য দেয় নি নীলিমা; দিলে এই বাড়ি-ঘরদোর হত না, কিন্তু পরোক্ষে একটা অসন্তোষের বহ্নি কোথায় যেন ধিকিধিকি জ্বলছিল। নীলিমার মা বা ভাই, ওদের কারুর হাতে এসব ভার দিলে নীলিমা হয়তো খুশী হত কিন্তু তাঁরা তো দিল্লির লোক, কলকাতায় এসে এসব কাজ করে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল কী? ছিল না। তা ছাড়া এ জমি কি সিনা তাকে নতুন বন্দোবস্ত করে দিয়েছে? বহু আগে। যখন এদিককার জমির দর ছিল রীতিমত সস্তা। নিজের জন্য কিনতে গিয়ে বন্ধুর কথাও ভোলে নি অনল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি, চলে এস।

সেই অনলদের প্রতি নীলিমার হঠাৎ-জাগা এই উচ্ছ্বসিত প্রীতি লক্ষ্য করে মনটা সত্যিই আনন্দে ভরে গেল। ওরা তো অবাক হয়ে যাবে নীলিমাকে হঠাৎ ও-ভাবে দেখে। মালবিকা দেবীর চোখে-মুখে যে অভাবিত বিস্ময় ফুটে উঠবে তা যেন এখান থেকেই নিরীক্ষণ করতে পারছেন তিনি। আর অনল? ভাবতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির একটা রেখাই ফুটে ওঠে।

পায়ে পায়ে ততক্ষণে সোমা এসে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে, তার অভ্যস্ত মৃদু কণ্ঠে সে ডাকল, বাবা! একটু যেন চমকেই উঠলেন মুখার্জি, বললেন, কী?

সামান্য ইতস্তত করে তারপরে বলে উঠল সোমা, মা হঠাৎ আবার কোথায় গেলেন?

হো-হো করে এবারে হেসেই উঠলেন মুখার্জি, বললেন, সিনাকে খুশী হয়ে ধন্যবাদ জানাতে গেছে। ওরা যা অবাক হবে না! ডিয়ার ওল্ড বয়! ওর নাম অনলকুমার। স্কুলে এক মাস্টারমশাই

ঠাট্টা করে ডাকতেন অগ্নিমিত্র বলে। আমরাও বহুদিন অগ্নিমিত্র বলে ডাকতাম। শেষ পর্যন্ত বিধাতাও ঠাট্টা করলেন। ওর স্ত্রীর নাম মালবিকা। হয়ে দাঁড়াল মালবিকাগ্নিমিত্র।

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সোমা। এমন উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলতে ওঁকে এর আগে কখনও দেখে নি সে।

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সামলে নিলেন মুখার্জি, মনে হল,—এসব কথা সোমার সামনে উত্থাপিত না করলেই ভাল ছিল। একটু থেমে অস্বস্তিকর মানসিকতাটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যই স্বাভাবিক করে বলে উঠলেন মুখার্জি, বুঝলে না তো? মালবিকাগ্নি-মিত্র মহাকবি কালিদাসের একটি নাটকের নাম। তারই উপমা দিচ্ছিলাম। শুনেছ কখনও কালিদাসের নাম?

মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল সোমা।

—শুনেছ! মুখার্জি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঃ!

মুখ নত করল সোমা, তারপরে টিপয়ের ওপর হাত রেখে, ঢাকা কাপড়টার কোণে যে ফুল আঁকা আছে, সেই ফুলে হাত বুলতে লাগল। মুখার্জিও স্তব্ধ হয়ে গেছেন। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে অন্যমনস্কচিত্তে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি, হয়তো ওঁর বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে অতীত দিনের কোন সুখকর স্মৃতি।

ধীর পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল সোমা। কালিদাস! কালিদাসের নাম সে শুনেছে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া-হাউসে ছেলে-মেয়েরা একবার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' অভিনয় করেছিল। মিস্টার সিদ্ধান্তই ছিলেন সব-কিছুর মূলে। মা-ও এসেছিলেন। মায়ের পাশে বসে 'শকুন্তলা' দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সোমা। তারপরে, বাড়ি ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে 'শকুন্তলা'র আলোচনা করেছিল, মনে পড়ে। 'শকুন্তলা'র সঙ্গে মায়ের স্মৃতি এমন ভাবে জড়িয়ে আছে! মায়ের কথা মনে পড়তে আজ কেন যেন হঠাৎ চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠল, বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে

উঠল। মনে হল, আর নয়, এখুনি সে ছুটে যাবে তার মায়ের কাছে। তার অভাগিনী মা—তার সর্বংসহা মা!

একটুক্ষণ নয়, বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল নীলিমা, বলল, মিষ্টি খেয়ে এলাম। না খাইয়ে ছাড়ল না। জান, বেশ বাড়ি! ওঁদের সত্যিই টেস্ট আছে। মালবিকা জিজ্ঞাসা করলে সোমার খবর কী? কেমন আছে? বললাম, পাশের বাড়ি থেকে তোমরা তা জান না? বললে, বড্ড লাজুক। মিশতে চায় না। তা হ্যাঁ গো, কোথায় সে? সেই একবার এসে প্রণাম করে কোথায় লুকোল?

—ঘরেই আছে। ডাক না?

—না থাক্। নীলিমা বললে, বেলা যথেষ্ট হয়ে গেছে। স্নান সেরে খেয়ে নেওয়া যাক। তোমার স্নান হয়েছে?

—কখন!

—বেশ। খেয়ে-দেয়ে এক ঘুম দিয়ে একটু বেরবে নাকি?

মুখার্জি বললেন, আমাকে তো বেরতে হবেই। টুকিটাকি অনেক কাজ আছে। একবার ব্যাঙ্কে যাব—

নীলিমা বলল, ভাল কথা। তোমার গাড়িটা 'বুক' করা হয়ে গেছে, দিন কয়েকের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। ইন্‌ভয়েস সঙ্গে এনেছি।

—ভাল। গৌতমের কী করলে?

—ও হস্টেলে আছে।

আর কোন কথা হল না। চেয়ার ছেড়ে যে যার উঠে পড়লেন।

মুখার্জির সারা দিনমান কেটে গেল সত্যিই নানান কাজে। একবার মেজদার বাড়িতে 'যাব-যাব' করেও যেতে পারলেন না। শ্রান্ত বোধ করে ফিরে এলেন সন্ধ্যার পরেই। কিছুক্ষণ পরে

শোবার ঘরে এসে যখন ঢুকলেন, দেখা গেল, তাঁর খাটের পাশে পড়েছে আর-একটা খাট।

ঘরে চায়ের তদারক করতে আর কেউ ছিল না, নীলিমা ছাড়া। সাংসারিক এ-কথা সে-কথার পর অবশেষে সরাসরি কাজের কথায় এল সে ঃ মা আসছেন, জান?

চকিতে ওঁর মুখের দিকে তাকালেন মুখার্জি, তারপরে মুখ নামিয়ে বললেন, কবে?

—দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।

'মা' মানে—নীলিমার মা, মিসেস বাটাসারিয়া, যিনি তাঁর ছেলে দুটির কাছে দিল্লিতে থাকেন।

চায়ের কাপে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন মুখার্জি, তা হঠাৎ অতদূর থেকে কলকাতা আসছেন যে?

—বাঃ রে, মেয়ে-জামাইয়ের নতুন বাড়ি দেখতে আসবেন না! আমিই চিঠি দিয়েছিলাম।

—তা ভালই তো।

নীলিমা ওঁর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে ওঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত স্থাপিত করে ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, জান, কী হয়েছে?

—কী?

নীলিমা বলল, সারা ভাইজাগে একটা স্ক্যাণ্ডেলই ছড়িয়ে গেছে।

—স্ক্যাণ্ডেল!

—তা ছাড়া আর কী! নীলিমা বলল, মিসেস ওয়াটকিন্স থেকে শুরু করে সবাই জিজ্ঞাসা করছে—ওই মেয়েটি কে? কম লোক তো আর তোমাকে সি-অফ করতে স্টেশনে আসে নি! সবাই দেখেছে তোমাকে রিজার্ভড কামরায় উঠতে একটি অচেনা মেয়েকে নিয়ে। সেই জন্যে মুখ ফুটে আমাকেই বলতে হল ওর সব কথা। কী লজ্জা!

উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, তারপরে খোলা জানলাটার দিকে ধীর পায়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, কেন! লজ্জা কেন?

—লজ্জা নয়। নীলিমাও উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, ওঁর কাছে আসতে আসতে বলতে লাগল, ওরা জিজ্ঞাসা করলে—বেঁচে আছেন কি তিনি, সেই লেডিটি? বললাম—আছে নিশ্চয়ই। নইলে চিঠি পাঠায় কী করে মেয়ের হাত দিয়ে! সবাই অবাক হয়ে গালে হাত দিল, বললে—এক স্ত্রী থাকতে আর-একবার বিয়ে করলেন কী করে মিস্টার মুখার্জি!

মুখার্জি জানলা ছেড়ে তাঁর খাটের দিকে সরে আসতে আসতে প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, তারপর?

—তারপর শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। নীলিমা বলল, যেখানেই যাই, এই আলোচনা। শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। কেউ বলে, সেই বউকে এবার ফিরিয়ে আনবেন মিস্টার মুখার্জি। আর কেউ বলে, সে মেম সাহেবটি কি এতদিন চুপ করে বসে আছেন? অন্য বিয়ে করেছেন এতদিনে, ছেলেপিলেও হয়ে গেছে, তোমরা দেখে নিও। আমি ভেবে দেখলাম, সেটাই সম্ভব। নইলে পঁচিশ বছর ধরে কি কেউ—

ততক্ষণে বিছানায় নিজেকে তলিয়ে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে কথাগুলি শুনেই যাচ্ছিলেন মুখার্জি, হঠাৎ কী ভেবে এইখানে বাধা দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, না।

একটু থেমে, একটু অবাক হয়েই মিসেস বলল, কী, না?

উত্তর দিলেন মুখার্জি, দ্বিধাহীন অকম্পিত কণ্ঠে, সে বিয়ে করে নি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজও পর্যন্ত সে মিসেস মুখার্জিই আছে।

—মিসেস মুখার্জি!

—হ্যাঁ।

ঠোঁট টিপে ঈষৎ চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল নীলিমা, বিয়ে হয়েছিল তা হলে সত্যিই?

—উত্তর কি পাও নি? আইনমত না হলেও, যেখানে আইন চলে না, সেই হৃদয়ের ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে।

—আছে নাকি!

কিন্তু আর কোনও কথা বললেন না মুখার্জি, চোখ বুজে পড়ে রইলেন বিছানায়। নীলিমাও মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল, আর একটি কথাও উচ্চারিত হল না তার মুখ থেকে।

পরদিন কিন্তু ভিন্নরূপ। নীলিমা যা কোনদিন করে না, তাই করে বসল। সোমা বোধ হয় কী করতে যেন এসেছিল ঘরে, তার সামনেই বলে উঠল মুখার্জিকে, আর কী, এবার বিলেত থেকে চিঠি লিখে আনিয়ে নাও তোমার সুজাতাকে, আমি বিদেয় হই।

সোমা বোধ হয় ঈষৎ চমকেই উঠেছিল, তারপরে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আশ্চর্য ঘটনা, আজ পঁচিশ বছর যার কথা কেউ জানত না সংসারে, তার কথা প্রতিটি দিন উচ্চারিত হতে লাগল এই বাড়িতে, কোন-কোনদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন মুখার্জি, চারিদিক থেকে বেয়ারা আয়া সব ছুটে আসত। সে এক নাটকীয় দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটত বটে! মুখার্জি চিৎকার করে বলছেন, তার নাম কখনও নেবে না তুমি।

—একশোবার নেব। সাপিনীর মত ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ স্বরে নীলিমা বলত, নেকী, সে আমার সব শান্তি হরণ করছে। আমি তাকে অভিসম্পাত করব, রোজ রোজ, প্রতিদিন—খোঁজ না চারিদিকে, যারা জেনেছে, তারাই ছি-ছি করছে।

শুরু হল এই কলহের তীব্রতা। প্রায় প্রতিদিন। সোমা যে ঠিক ওই সময় কোথায় লুকিয়ে পড়ত, তার সন্ধান কেউ রাখত [illegible] যে [illegible], সে অন্য লোক, একেবারে অন্য জাতের অন্য জগতের লোক।

পুবের জানলা দিয়ে ভোরের প্রথম সূর্যকে প্রণাম জানাতে

শিখিয়েছিলেন তার মা। বলতেন, হিন্দুদের কাছে সূর্য পবিত্র দেবতা। প্রকৃতি যে মানুষের দেহ আর মন দুই-ই সঞ্জীবিত করে তোলে, এটা হিন্দুদর্শন যতটা বুঝেছে, আর-কেউ তা বোঝে নি। সূর্য তোমার দেহও ভাল রাখবে, মনও ভাল রাখবে।

মনেপ্রাণে হিন্দু হতে চেষ্টা করেছে সোমা। তার মায়ের একান্ত তপস্যাতেই ওটা সম্ভব হয়েছে। বিলেতে ইণ্ডিয়া-হাউসে যাদের যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে সোমা, তারা বাংলা কথা বলে বটে, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে তারা বিলেতকে অনুসরণ করতে চায়।

ভাল লাগত না। এক, মিস্টার সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি কাজের মানুষ। তাঁর সঙ্গ কতটা পাওয়া সম্ভব সোমার পক্ষে? এখানে বাবার আচার-বিচারেও সাহেবিয়ানা, খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে পর্যন্ত তাই। কিন্তু তবু মনে হয়, বাবার মধ্যেকার লোকটি প্রাচীন ভারতের সেই তপোবনের কোন ঋষি, অরণ্যে না থেকে সংসারে বাস করছেন ছদ্মবেশ ধারণ করে। কিন্তু মা আসার পর থেকে বাবাকে কাছে পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। দূর থেকে বাবার কণ্ঠস্বর কানে আসে, আর যেন সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছেড়ে এসে জানলায় দাঁড়ায় সোমা। পুবের আকাশে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেবের উদয়ের প্রতীক্ষা করে। উঁচু উঁচু বাড়ি নেই পুবদিকে, অনেকটা দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এক-একদিন হঠাৎই চোখ পড়ে নিচের দিকে। তাদের বাড়ির প্রায় গা ঘেঁষে একটা একতলা ছোট্ট বাড়ি। সবটাই দেখা যায় উঠনের, অনেক লোক। ছেলে মেয়ে। হৈ-চৈ। একটা জানলা দিয়ে একটা টেবিল নজরে পড়ল একদিন। অনেক বই টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো। কী কী বই কে জানে! একটি লোককেও দেখা যায়, সেই টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বই টেনে নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছে, কখনও বা কী সব লিখছে। বাড়ির মধ্যে এত হট্টগোল, লোকটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, একমনে নিজের কাজ

করে চলেছে। বেশ লাগল কিন্তু অধ্যয়নের এই রূপ দেখে। সূর্যপ্রণামের পর লোকটির দিকে অলস দৃষ্টি ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখা এ যেন তার নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কদিন ধরে।

কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে একদিন যে তার হঠাৎই আলাপ হয়ে যাবে, এটা সে ভাবতে পারে নি।

বিকেলের দিকে বাবা যখন বাড়ি থাকেন না, মাও ভাইজাগ-থেকে-আসা তাদের গাড়িটা নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে যান, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই খালের ধারটায় গিয়ে একটু পায়চারি করত সোমা।

অজস্র লোক মাটি কাটছে, আরও গভীর করে তুলতে চায় তারা ক্যানেলটাকে। একটা মাটি-কাটা যন্ত্রও কাজ করছে সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখত সোমা। তাদের লণ্ডন-ডকের শ্রমিকদের মতই হয়তো ওদের জীবন, শুধু চেহারায় তফাত, পোশাকে তফাত। এবং সম্ভবত আরও গরিব এরা।

গরিব তো সে নিজেও। গরিব তার মা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেই তাকে এত বড়টি করে তুলেছেন মা। স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে কিন্তু নিজের মেয়ের গায়ে স্কচ হাওয়াটিও লাগতে দেন নি, পরিপূর্ণ বাঙালী করে তুলতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষা শেখানো, সে কি সহজ কথা! ভাষা হয় তো, উচ্চারণ হয় না। শেষ পর্যন্ত টাকা খরচ করিয়ে মিস্টার সিদ্ধান্তকে দিয়ে বাংলা উচ্চারণ রেকর্ড করিয়ে নেওয়া। সেই রেকর্ডগুলি বার বার বাজিয়ে তবে শিখতে হয়েছে সঠিক উচ্চারণ। এ ছাড়া ইণ্ডিয়া-হাউসের বাঙালীদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলার অভ্যাস তো আছেই।

—নমস্কার।

নিজের চিন্তায় এত মগ্ন ছিল সোমা যে, কাছে এক ভদ্রলোক যে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সে মোটেই খেয়াল করে নি। অকস্মাৎ অত্যন্ত কাছে একজনের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ানক চমকে উঠল সে।

—আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল সোমা। সেই লোক। সেই একতলা বাড়ির টেবিলের-উপর-ঝুঁকে-বই-পড়া ছোট্ট ঘরের লোকটি। মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল, চোখে চশমা, কালো কালো দোহারা চেহারা। কোন রকমে হাত তুলে প্রতিনমস্কারটা জানাল সোমা, চট করে কোন কথা বলতে পারল না।

লোকটি বললে, বাড়ি ফিরছিলাম। লক্ষ্য করলাম আপনাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, লোকজন যে যার সব ফিরে গেল, আপনি চুপচাপ একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু থেমে, একটু ইতস্তত করে তার পরে আবার বলল লোকটি, আমিও চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, আলাপটা করেই ফেলি না। সাহেব-বাড়ির মেয়ে, অথচ রোজ ভোরবেলা জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে প্রণাম করতে দেখে অদ্ভুত লাগে। মাপ করবেন, আমার কথাগুলি আপনি বুঝতে পারছেন তো?

সোমা অবাক হয়ে বলল, কেন পারব না!

লোকটি বলল, তা তো বটেই। বউদিও তাই বলেন, বিলেতের মেয়ে হলেও বাংলা আপনি খুব ভাল বলতে পারেন।

—বউদি কে!

লোকটি তাড়াতাড়ি বললে, আমার বউদি। আপনাদের সব খবর রাখে। আপনাদের বাড়ির আয়াটি যে রোজ আমাদের বাড়িতে আসে। না না, আপনি যেন তার ওপর রাগ করবেন না, মন্দ সে কিছু বলে না, আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বিশেষ করে আপনার প্রশংসায়।

একটু অস্বস্তিই বোধ করছিল সোমা, একটু কঠিন কণ্ঠেই বোধ হয় সে বলে ফেলল, মাপ করবেন, আলোচনাটা একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না?

মুহূর্তে অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল লোকটি, হ্যাঁ, তা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি চলি।

বলে আর দাঁড়াল না, দ্রুত চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

অদ্ভুত তো লোকটি! হয়, অদ্ভুত সরল, আর নয় তো—অদ্ভুত চতুর। কিংবা এ ধরনের লোক সম্বন্ধে সোমার কোন ধারণাই নেই, এ কেমন লোক কে জানে!

পরদিন জানলায়। লোকটি তেমনি মুখ নিচু করে কী-যেন একমনে লিখে চলেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করল সোমা, একবারও মুখ তুলল না।

রোজই বিকেলে ক্যানেলের ধারে তেমনি বেড়ায় সোমা, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয় না।

দেখা হল আবার হঠাৎ চার-পাঁচ দিন পরে। ততদিনে তাদের বাড়িতেও এক নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তার নতুন মায়ের মা এসেছেন, মিসেস বাটাসারিয়া। সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক, তাঁর ছোট ছেলে, অর্থাৎ তার নতুন মায়ের ভাই। সবাই মিলে অদ্ভুত জটলা—মা তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, বলছেন, এখান থেকে তুমি আমাকে নিয়ে চল মা, এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

সেই ভদ্রলোকটিও রেগে গেছেন। চাপা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠছেন, সেই মেয়েটি কোথায় গেল! ছাট্ সি-ডেভিল!

—ছি-ছি! দুটি কানে দুটি হাত চেপে সোমা ছুটে পালাল দূরে। নিজের ঘরে নয়, একবারে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের রান্নাঘরে। বাবাও বেরিয়ে গেলেন যেন কোথায়, আর সেও পায়ে পায়ে চুপি চুপি বেরিয়ে এল বাইরে, ক্যানেলের ধারে।

কিন্তু বড় বিশ্রী লাগে! রোজ রোজ বাড়িতে অশান্তি। যেন চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে বার বার! কী করবে সে? তার জন্যই কী এত অশান্তি? সে তো এই মুহূর্তে অন্য কোথাও থাকার জায়গা করে নিতে পারে। চেষ্টা-চরিত্র করে একটা চাকরি

সংগ্রহ করতেও বা কতক্ষণ! লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট সে, তা ছাড়া, ইণ্ডিয়া-হাউসের চাকরির অভিজ্ঞতা তো আছেই।

কিন্তু বাবার মুখ চেয়ে তা সে পারে না। বাবা কথা বলেন কম, কিন্তু কথা না বলে প্রকাশ করেন তার ঢের বেশী। বাবা যে তাকে কত ভালবেসে ফেলেছেন, সে কি তা বুঝতে পারে না? সে নিজে তো বাবাকে ছেড়ে থাকার কল্পনাও করতে পারে না।

মাকে আরও একখানা চিঠি দিয়েছে সোমা। সব কথা জানিয়ে।—'তুমি কিন্তু কোন চিঠিরই উত্তর দিও না মা,; আমি উত্তর দিতে না লেখা পর্যন্ত। আর বাবা? বাবা সারাটি জীবন ধরে বঞ্চিত, বুঝলে মা? সবাই তাঁর কাছ থেকে সব পেয়েছে, তাঁকে কেউ কিছু দেয় নি। বাবার মাথার চুলগুলি সব সাদা। কিন্তু তাতে করে কী অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা তুমি জান? মনে হয়, বৃহদারণ্যের কোন ঋষি। বৃহদারণ্যক মনে আছে তো? মিস্টার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ো। বোল, সোমা এ-কথা জেনে নেবার জন্য লিখেছে।'

—নমস্কার!

আবার সেইরকম চমকে উঠে নিরুত্তরে কোনরকমে হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানাল।

লোকটি বলল, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে পড়েছেন। এটা হচ্ছে বেহালার পোল। পার হয়ে ওপারে যাবেন?

—কেন?

লোকটি বলল, ওপারে গিয়ে বাঁ দিকে নামব। নেমে নতুন নতুন বাড়িগুলির পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুর্গাপুরের পোল। সেটা পার হয়ে আবার এপারে এসে একেবারে বাড়ি, যে যার পথে চলে যাব।

সোমা বলল, আপনার সঙ্গে অনর্থক হাঁটতেই বা যাব কেন?

মুহূর্তে সেইরকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল লোকটি, বলল, তা তো বটেই—তা তো বটেই।

বলে আর দাঁড়াল না, যে পথে বাড়ি ফিরছিল, সেই পথে ফিরল না—বেহালার পোল পার হয়ে ওপারে যেতে লাগল।

ঠোঁটের কোণে হাসিই এল সোমার। নাঃ, লোকটির মনে অন্য-কিছু নেই। লোকটি সরলই হবে বটে।

পরদিন। দেখা হল না। সোমা বেড়িয়ে ফিরল। বাবা তখনও আসেন নি। মায়েরা যেন কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন, সঙ্গে সুমনা। সে এসেই একেবারে ওর ঘরে।

—কী করছ দিদি?

সোমা হেসে বলল, দিদি বলে ডাকলে তা হলে?

—ডাকলাম। কিন্তু আচ্ছা মানুষ তো তুমি! আমি আসতে পারি নি বলে তোমারও কি যাবার দরকার নেই?

তারপরে গলার স্বর নামিয়ে চাপাকণ্ঠে বলল, তা ছাড়া আছই বা কী করে এখানে? সব তো শুনলাম। বুঝলাম, অশান্তির আগুন জ্বলছে বাড়িতে। পুড়ছ কেন? বেরিয়ে আসতে পার না?

ঝরঝর করে এতক্ষণে কেঁদে ফেলল সোমা। বলল, আমি চলে গেলেই কি অশান্তির শেষ হবে?

সুমনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল, তারপরে বলল, না, তা ঠিক হবে না। তোমার মার ছায়াকে কেন্দ্র করে কাকা আর কাকীমা শূন্যে তরোয়াল ঘোরাবেনই।

—তবে?

ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে সুমনা বলল, নিজে তো বাঁচতে!

—না ভাই। সোমা বলল, বাবাকে ছেড়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেও পারছি না। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া?—সুমনা বলল, থামলে কেন? বল?

সোমা ওর একটি হাত হাতের মধ্যে নিয়ে তারপর বলল, বাবার সঙ্গে আজকাল বেশী কথা হয় না। কিন্তু ওঁর চোখে আমি কী দেখেছি জান?

—কী?

সোমা বলল, সে যে কী স্নেহ, কী ভালবাসা দুটি চোখে ফুটে ওঠে, তা বোধ হয় সহস্র আদর করেও মানুষকে মানুষ বোঝাতে পারে না।

সুমনা বলল, আমি বুঝি। জান, ওঁদের একটি মেয়ে ছিল মিলি বলে। মারা গেছে।

সবিস্ময়ে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সোমা, তারপরে বলল, তাই নাকি! কিন্তু এ-কথা তো কেউ কোনদিন বলে নি আমাকে!

—কোন্ কথাটাই বা কে তোমাকে বলেছে! নিজের বাপের বাড়ি, আছ তো পরের মত!

—না না, তা নয়—

সুমনা বাধা দিয়ে বলে উঠল, তা নয় আবার কী? এক কোণে তো পড়ে থাক, কে তোমার খোঁজ নেয় কতটুকু?

—না ভাই,—সোমা বলল, বেশ ভাল আছি। বুঝতেই তো পার, নিরিবিলিই আমার ভাল লাগে। কিন্তু এসব থাক্, তুমি আমাকে মিলির কথা বল।

সুমনা বলল, ফোটো দেখ নি?

—না। মা এসে কত ফোটোই তো দেয়ালে দেয়ালে সাজিয়েছেন, কোন্‌টা যে কার, তা জানি না।

—হয়তো অবকাশ আসে নি। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ফোটোটা খুঁজে বার করি।

—না না, থাক্, ওঁরা কী মনে করবেন?

—বাঃ রে, মনে আবার করবেন কী! সুমনা বলল, এস আমার সঙ্গে।

—না না, আমি যাব না।

—বেশ। বসে থাক্। আমি যাচ্ছি।

সত্যি-সত্যিই গেল সুমনা, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বলল, খোঁজ পেয়েছি দিদি। কাকুর ঘরে ছবিটা রয়েছে। কোথায়

জান? খাটের পাশে, যেখানে কয়েকটা ছবি টাঙানো—কাকুর নিজের, গৌতমের, তারপরে আমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের, এ ছাড়া ছোট্ট একটা গ্রুপ ছবি, তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে মিলির ছবি। তোমার চোখে পড়ে নি কখনও?

একটু ভেবে সোমা বলল, বুঝেছি। দেখেছি ছবিটা। কিন্তু ওটা যে—

ওর দুটি হাত ধরে বলে উঠল সুমনা, এস, এখন একবার দেখবে এস।

—না। সোমা ওর হাত ছাড়িয়ে নিলঃ ওঁদের ঘরে আমি যাই না।

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল সুমনা, ও মা, কেন? কাকুর ঘরেও যাও না?

অভিমানে ছলছল করে এল দুটি চোখ, সোমা বলল, না।

—কেন?

সোমা নিরুত্তর।

—বলবে না আমাকে? কেন?

মুখ তুলল সোমা, বলল, আমি যাই না। আমি গেলে মা এমন সব কথা তোলেন, আমি শুনতে পারি না, ছুটে চলে আসতে হয়।

সুমনার কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল, বলল, বুঝেছি কোন্ ধরনের কথা ওঠে তোমার সামনে। নিশ্চয়ই তোমার মায়ের কথা?

সোমা উত্তর দিল না, মাথাটা নীচু করল, মেঝের দিকে নিবদ্ধ ওর দৃষ্টি।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর সুমনা বলল, আচ্ছা দিদি, কাকুও তোমাকে ডাকেন না?

মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে সোমা জানাল, না।

—এ ভারি অন্যায় কাকুর। ডাকেন না কেন?

—ও-কথা বোল না। সোমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাবা যে কত অসহায়, আমি তো জানি!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমনা বলল, বুঝেছি।

আর-কোন কথা নয়। চুপ করে রইল দুজনে।

একটু পরে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সুমনা। কাকুর ঘরে কাকীমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাকুকে কী যেন বলছেন, কথা বোঝা যাচ্ছে না— শব্দ ভেসে আসছে শুধু।

কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় বলে উঠল সুমনা, দেখ দিদি, আমি কিন্তু একটা কাজ করতে পারি। করব?

—কী?

সুমনা বলল, কাকুর ঘর থেকে মিলির ফোটোটা নিয়ে আসব?

—আসবে? উৎসাহিত বোধ করেও পরমুহূর্তে নিস্তেজ কণ্ঠে বলে উঠল সোমা, না, থাক্। আমি তো দেখেছি। অন্য এক সময় আর-একবার চুপি চুপি দেখে নেব, যখন বাবা-মা বাড়ি থাকবেন না। কেমন?

—বেশ।

আবার দুজনে চুপচাপ। দুজনেরই মনে তখন বোধ হয় একই চিন্তার তরঙ্গ উঠেছে। একজন মিলিকে দেখে নি, আর-একজন দেখেছে।

—আচ্ছা সুমনা?

—বল?

আগ্রহে সোমা জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গে কি মিলির কোন মিল আছে?

সুমনা বলল, তোমার মত অত ফরসা তার গায়ের রঙ নয়। তবে সে-ও বাপমুখী মেয়ে, তুমিও তাই। মিল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

—তবে?

—কী তবে?

বলতে গিয়ে ধরে এল সোমার গলা, মা তো মিলি-হিসাবেও আমাকে কাছে টেনে নিতে পারতেন।

ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল সুমনা, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে সমস্ত গাম্ভীর্য আর থমথমে আবহাওয়াটাকে দূর করে হঠাৎ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল, ও-সব কথা থাক্‌ তো! চল একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

ওর হাত ধরে টানতে লাগল সুমনা, আহা, চলই না। আমি কাকুর অনুমতি নিয়ে আসছি।

বলে আর কোনও কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সুমনা।

সোমা ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল তার প্রিয় জানলাটির কাছে। ও-বাড়ির একতলার সেই জানলাটিই চোখে পড়ল আগে। আলো জ্বলছে। আর মোটা একখানা বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই লোকটি। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটে যাচ্ছে এই মুহূর্তে খেয়াল নেই, সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করে আছে বইয়ের মধ্যে।

—দিদি!

নিদারুণ চমকে যেন কেঁপে উঠল সোমা, তারপরে তাড়াতাড়ি সরে এল জানলার কাছ থেকে। যেন গোপন কোন অপরাধ ধরা পড়ে গেছে, এমনি অপ্রস্তুত তার ভঙ্গী, পাংশু তার মুখের বর্ণ।

কিন্তু সে সব লক্ষ্য করবার মত অবকাশ ছিল না সুমনার, সে তার পিছনের দরজাটি বন্ধ করে এগিয়ে এল তার কাছে, বলল, বাক্স খোল। শাড়ি বার কর। নিজের হাতে আজ তোমাকে সাজাব।

বলেই গুনগুন করে উঠল, তোমায় সাজাব যতনে, কুসুমে রতনে কেয়ুর-কঙ্কণে—

সবিস্ময়ে বলে উঠল সোমা, বাঃ, চমৎকার গাও তো তুমি!

চটুলকণ্ঠে সুমনা বললে, মানুষটিকে তো চিনলে না, আমার মধ্যে অনেক গান আছে গো, অনেক গান আছে। নাও, চটপট সেজে নাও। কাকু-কাকীমা, দুজনেরই অনুমতি নিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে নিজেই ওর কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে মনের মত শাড়ি ব্লাউজ সায়া খুঁজে বার করে ওকে পরাতে শুরু করল। বলল, চুল তো ভালই বাঁধা আছে, কাপড় পরে নিলেই হয়। নাও, পরো।

সোমা ওর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলল, কোথায় যাবে?

—কোথায় আবার! আমাদের বাড়ি।

—এত রাত্রে?

—রাত কোথায়? আটটাও বাজে নি। কলকাতার এটা রাতই নয়।

—সঙ্গে কে যাবেন? বাবা?

—না গো, সুমনা ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, আমি আর তুমি। সঙ্গে ড্রাইভার।

—ড্রাইভার! অবাক হয়ে সুমনা বলল, আমাদের তো ড্রাইভার নেই! বাবা নিজেই ড্রাইভ করেন। মা একা যখন যাতায়াত করেন, তখন যান ট্যাক্সিতে। আমরাও কি ট্যাক্সি নেব?

—না। নাও দেখি, ও-জামাটা খুলে এ-জামাটা পর।

পরতে পরতে সোমা বলল, কী যে তোমার মনে আছে কে জানে!

-তা বলতে পার। সুমনা শাড়িটা ঠিকঠাক করে দিতে দিতে বলল, মনের কথা মনেই আছে। তা হলে শোন। আজ গাড়ি আর ড্রাইভার সঙ্গে করেই এনেছি। চোখ চেয়ে দেখ না তো কিছু? নইলে হর্নের শব্দ পেয়েই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে, আর দেখতে পেতে কাকীমাদের নিয়ে আমিই আসছি নতুন ঝকঝকে 'ন্যাস্' কার নিয়ে, সামনে-পিছনে 'জি-বি' লেবেল বসানো, অর্থাৎ পারচেজ্‌ড্ ইন্ গ্রেট বৃটেন, বুঝেছ?

সোমা বলল, জ্যেঠামশাই কিনেছেন বুঝি?

—না গো, তোমার মেজ জ্যেঠামশাই রিটায়ার্ড ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, গাড়ি-টাড়ি কেনা তাঁর মতে বাজে খরচ। ছোট্ট একটি

'মরিস' ছিল, রিটায়ার করে তা-ও বেচে দিয়েছেন। এখন যে কোম্পানির উনি 'ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসার,' তারা দু বেলা গাড়ি দেয়, সুতরাং ওঁর কাজও চলে যায়।

—তবে ?

—তবে এই 'ন্যাস' কার তো ? চল না, সবই দেখতে পাবে। কার গাড়ি তাও দেখতে পাবে, আর এই গাড়িতে আমিও রাজেন্দ্রাণীর মত কেমন করে বসেছি, তাও জানতে পারবে।

সকৌতুকে সোমা বলল, কী যেন একটা আন্দাজ পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে ?

হেসে ফেলল সুমনা, তারপরে ওর কাছে এসে ওর মুখখানা দু হাতে ধরে আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

—হচ্ছে কী ?

সুমনা ওর গলা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, সত্যি, তুমি কি সুন্দর দিদি! আমার ইচ্ছা করছে তোমার গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটিতে পড়ে পড়ে চুমু খাই।

বিচিত্র মানসিকতার মধ্যেও হেসে ফেলল সোমা, তারপরে বলল, বেশ তো, শখটা মিটিয়েই নাও না।

কথাটা পরিহাস করেই বলা। কিন্তু ওকে জড়িয়ে ধরে সত্যি সত্যি চুম্বন করল সুমনা, তারপরে ওকে ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল, জান দিদি, কেন আসতে পারি নি এ ক'দিন! প্রেম করছিলাম।

—কী রকম ?

সুমনা বলল, হয়তো শেষ পর্যন্ত বিয়েই করব।

—কাকে ?

সুমনা বলল, ওই ন্যাস কারের মালিককে।

—সে তো ভালই। কিন্তু ব্যক্তিটি কে ? পরিচয় দিতে চাও না ?

সুমনা বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল, বলল, শুনে যেন আবার আমার বাপ-মার মত আকাশ থেকে পড়ো না ? এক সিনেমা-অভিনেতা। কী ? চমকে উঠলে নাকি মনে মনে ?

—না, তা কেন ?

সুমনা বলল, আমার কাহিনী শুনতে ক্লান্তিবোধ করছ না তো ? সত্যি বল ?

—কী বলছ ! খুব ভাল লাগছে শুনতে। তার পর ?

এক মুহূর্ত থেমে থেকে, সুমনা অপেক্ষাকৃত লঘুকণ্ঠেই বলল, বাইরের কোনও ব্যাপারেই তো তোমার উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই। এ ব্যাপারে তো খুব উৎসুক হয়েছ দেখছি !

হেসে ফেলল সোমা, বলল, এ যে আমার বোনের ব্যাপার, আমার একমাত্র বন্ধুর ব্যাপার। তা ছাড়া, প্রেম-কাহিনী কার না ভাল লাগে শুনতে ?

সুমনা ওর দুটি হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে ওকে আরও কাছে সরিয়ে আনল, তারপরে বলল, না দিদি, সত্যি কথা বলি। আমি ঠিক হালকা ধরনের নই, বলতে পার, বেশ সীরিয়াস মেয়ে। সিনেমা-টিনেমা বিশেষ দেখি না, হিরোদের নামও মুখস্থ করি না। এ লোকটি আমাদের পাড়ায় বাড়ি করেছে সম্প্রতি। আমি কিছুই জানতাম না। কবে যেন আমাকে রাস্তায় পথ চলতে দেখেছিল। কী দেখেছিল আমার মধ্যে, কে জানে ! একদিন খোঁজখবর নিয়ে একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। পরনে দামী স্যুট, হাতে সিগারেটের টিন। সরাসরি বাবাকে বলল, আপনার মেয়েকে সিনেমায় নামতে দেবেন ? অদ্ভুত ফটোজেনিক ফেস্, অদ্ভুত ফিগার !

শুনে আমি তো হেসে বাঁচি না। আমার নাকি অদ্ভুত ফিগার !

বলে হেসে উঠতেই সোমা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, নয় কেন ? ভদ্রলোকের চোখ আছে।

—ছাই আছে ! সুমনা বললে, বাবার সামনে 'ফিগার' কথাটা উচ্চারণ করল ! আমি তো ভাবতেই পারি না। যাক গে, তারপরে শোন।

—বল।

দুজনে খাটের ওপর বসল এসে পাশাপাশি। সুমনা বলল, বাবা তো অন্য ধাতের মানুষ, শুনে লোকটিকে এই মারেন তো সেই মারেন। ফাইন্যান্সের পুরনো সেক্রেটারি, তার মেয়ে সিনেমায় নামবে কী?

—তার পর?

সুমনা বলল, পালাল। অবশ্য তখনকার মত পালাল। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার একদিন এসে উপস্থিত। কী অদ্ভুত মানুষ ভাই! তবে এদিন ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে। হাতে সিগারেটের টিনটিও নাকি ছিল না। বাবাকে সরাসরি বলে বসল, এবার অন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

বাবা এতেও চটে আগুন, বললেন, বেরও আমার বাড়ি থেকে।

লোকটি নাকি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, আহা, চটলেন কেন? আমি আজও বিয়ে করি নি। এম-এ পাস করে দরজায়-দরজায় কাজের জন্য ঘুরছিলাম, কিন্তু পাস-টাস কোন কাজে লাগল না, কাজে লাগল চেহারাটা। এখন বাড়ি-গাড়ি আর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, বছরে বছরে মোটা টাকাই ইনকাম-ট্যাক্স দিয়ে থাকি।

বাবা তখনও রেগে। বললেন, তবুও তুমি অভিনেতা। আমি মত দিতে পারি না। দুঃখিত। লোকটি আবার এসেছিল। আবারও দেখা করেছিল বাবার সঙ্গে একই প্রস্তাব নিয়ে। বাবারও একই উত্তর, দুঃখিত। তা ছাড়া, আলোচনা করে দেখেছি বাড়িতে আমার মেয়েরও আপত্তি আছে এ বিয়েতে। লোকটি চলে গেল। গেল অবশ্য দিনকয়েকের জন্য। ছাড়বার পাত্র সে নয়।

সুমনা একটু থামতেই সোমা বলে উঠল, চমৎকার তো! বিদ্বান, রূপবান, ধনী—আর কী চাই?

সুমনা বলল, আর চাইবার কিছু নেই। কিন্তু আমি মেয়েটি যে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তারপরে শোন। লোকটি একদিন রাস্তায় আমায় ধরেছে। ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে আসছি বাড়ির

দিকে, হঠাৎ হুস্ করে একটা মোটার এসে থামল পাশে। তাকিয়ে দেখি, লোকটি। বললে, এক্স্ কিউজ মি। চট্ করে মোটারে উঠে আসুন।

অবাক হয়ে বললাম, কেন?

লোকটি বলল, আমি চঞ্চল ব্যানার্জি। নিশ্চয়ই চেনেন। উঠে আসুন। হিরোকে দেখলে এক্ষুনি লোক জড়ো হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। প্লীজ।

কী ভেবে আমিও সত্যি সত্যি উঠে পড়লাম মোটারে। তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি দিদি, আমিও পোড়-খাওয়া মেয়ে এবং এ যুগের মেয়ে। আমার কোন ক্ষতি করা অত সহজ নয়। তাই নির্ভয়েই গাড়িতে উঠেছিলাম।

গাড়ি চলল হুস্ করে বেরিয়ে একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল আর ময়দান ছাড়িয়ে সেই গঙ্গার ধারে।

বলল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হিরোকে এখন চট্ করে কেউ চিনতে পারবে না। তা হলেও গাড়ি থেকে নামবার দরকার নেই। যা বলবার এখানে বসেই বলি। অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত কথা। এবং সংক্ষিপ্ত সময়েই বলতে হবে। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমার ট্রেন। আউটডোর সুটিংয়ে যাচ্ছি।

—বলুন।

লোকটি বলল, দেখুন, ভূমিকা করা আমার ধাতে পোষায় না আজকাল। তাই সরাসরি প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। বিয়ে করতে আপত্তি করছেন কেন আমাকে?

বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, এসব কথা আমাকে বলছেন কেন? বাবার কাছে উত্তর কি পান নি? আর তা ছাড়া সিনেমার নায়িকা হবার সাধ আমার নেই।

বললে, ছি-ছি! সিনেমার নায়িকা কেন? আমার জীবনের নায়িকা হতে বলছি আপনাকে।

—কিন্তু আপনার প্রথম প্রস্তাব তো তা-ই ছিল।

—সেটা আমার ভুল। নিজের মনটা বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল। কী? রাজী?

বিরক্তির তখনও আমার শেষ নেই, বললাম, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন বড় রাস্তায় আমাকে কোথাও। এসব কথা আমাকে বলবেন না।

লোকটি একথা শুনে অদ্ভুত কাতরতা প্রকাশ করে বলল, বিশ্বাস করুন, আপনাকে না বলে উপায়ও নেই। আপনার বাবা তো স্রেফ্ আমাকে 'হাটাউ' করে দিয়েছেন।

অদ্ভুত ওর কথাবার্তার ধরন। হাসি চেপে বললাম, 'হাটাউ' মানে?

—মানে একটা কিছু ধরে নিন না!—লোকটি বলল, দেখুন art of wooing আমি জানি। কিন্তু আমার সময় নেই। বেশ কটা দিন আপনাকে নিয়ে ঘুরে শেষ পর্যন্ত যে কথাটা বলতাম, সেটা প্রথমেই বলে ফেললাম। বাকী কথাগুলি আপনি 'fill-up-the-gaps' করে নিন না মনে মনে!

সোমা সকৌতুকে হেসে উঠল এই সময়। সুমনা বলল, শোনই না তারপর। বললাম, আমার দিকেই বা আপনার এত ঝোঁক কেন?

লোকটি বললে, এই 'কেন'র উত্তর দিতে গেলে আমাকে কতগুলি কথা বলতে হয় জানেন? আমার যে সময় নেই। ট্রেনের টাইম হয়ে এল। এখন পঞ্চাশ মাইলের গতিতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

সুমনা থামল। সোমা সাগ্রহে প্রশ্ন করল, তারপর?

সুমনা উঠে দাঁড়াল, বলল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেও অপেক্ষা করছে তার বাড়িতে। তার তো সময় নেই। কখনও সময় থাকে না। মনে-মনে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে সাংঘাতিক। আমি ইচ্ছে করেই একটু দেরি করলাম। তোমাকে সব কথা না বললে, তুমিই বা সব কিছু বুঝবে কী করে?

—মানে!

সুমনা বলল, চল আমার সঙ্গে। তাকে চাক্ষুস দেখবে। তার সঙ্গে আলাপ করবে।

ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত সঙ্কোচ অনুভব করে সোমা বলল, তা সে সব এখন কেন? এখন থাক্।

—তবে কখন?

সোমা ওর চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করে বললে, বিয়ে হোক। তারপর আলাপ করব।

—বিয়ের কথা তো বলি নি দিদি।

—তবে!

সুমনা বলল, সেদিন জোর করে নেমে যাচ্ছিলাম গাড়ি থেকে। বলেছিলাম, নামিয়ে দিন শীগ্‌গির। নইলে চিৎকার করব।

সে বলল, বেশ। কিছুদিন আপনাকে ভাববার সময় দিলাম।

আউটডোর সুটিং থেকে ফিরে এসে আবার আমাকে ধরেছে, বলল, কী হল?

জান দিদি, আজ আমার 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার পালা। গিয়েছিলামও বলতে একেবারে ওর বাড়ি। কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। বললাম, গাড়িটা দেবেন? যাব আর আসব? আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। বন্ধুও বটে, বোনও বটে। সে থাকলে, কথার সুবিধা হবে।

বলে, তোমার সব কথা ওকে বললাম। শুনে বলল, ইন্‌টারেস্টিং! নিয়ে আসুন আপনার বোনকে। কিন্তু বেশী দেরি করবেন না, আজ আমার নাইট-সুটিং আছে।

এই তো এলাম, এবার তুমি চল।

মনে মনে খুব সায় না দিলেও, সুমনার পীড়াপীড়িতে যেতে হল।

বাড়ি-গাড়ির বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। ভদ্রলোক গাড়ির শব্দ শুনে নিজেই তরতর করে নেমে এলেন নীচে। বেশ সপ্রতিভ

ব্যক্তি। তাড়াতাড়ি বসবার ঘরে বসিয়ে স্বাগত-সম্ভাষণ শেষ করে বলে উঠলেন, আমার সুনাম, আমি সুটিংয়ে কখনও দেরি করি না। কিন্তু অলরেডি এক ঘণ্টা লেট্। আপনার সঙ্গে ভাল করে যে আলাপ করব সোমা দেবী, তারও সময় নেই। এমন কি অতিথি-সম্ভাষণের ভারটাও আমি সুমনা দেবীকে আজ দিয়ে যেতে চাই।

বলেই সুমনার দিকে তাকিয়ে, প্লীজ। স্টুডিওর লোকদের খুব ক্ষতি হবে। আপনার কথাটা শুনিয়ে দিন, শুনে আমি চলে যাই। সোমা দেবী আমার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুমনা কী ভেবে বার বার তাকাচ্ছিল সোমা আর চঞ্চলের দিকে, বলে উঠল, অত চঞ্চল হলে চলে না। একদিনের জন্য হোক ক্ষতি।

—হোক! বলে, কী আশ্চর্য, সোফার গায়ে নিশ্চিন্তে নিজেকে এলিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। তার পরে শুরু করলেন বেয়ারাদের ডাকাডাকি।

—আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জি, সোমা বলল, তার চেয়ে আপনাদের কাজের কথাটা হোক। আমি বরং ঘুরে ঘুরে আপনার বাড়ির সামনের লনটা একটু দেখি। আপত্তি নেই তো?

—না না, মোস্ট গ্ল্যাড্লি। কিন্তু—

বাধা দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সুমনা, বলল, আমিও যাই। আপনি কাজের ক্ষতি না করে স্টুডিওতেই যান। আমি কাল আসব সন্ধ্যেবেলা আমার শেষ কথা জানাতে। বাড়ি থাকবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

বলে স্তম্ভিত বিস্মিত চঞ্চলের সামনে দিয়েই সোমাকে টেনে নিয়ে চলে এল সুমনা।

কয়েক মুহূর্ত পরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল চঞ্চল, ওদের পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, একটু দাঁড়ান। গাড়ি যাচ্ছে।

বলতে-না-বলতে নিজেই অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে ড্রাইভার

নামিয়ে দিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে এল ওদের সামনে, বলল, উঠুন আপনারা। স্টুডিওতে যাবার মুখে পৌঁছে দেই।

সুমনা সোমার হাত ধরে বলল, এস।

উঠল দুজনে। সুমনা বলল, আমার বাড়ির সামনে থামাবেন। আমি নেমে যাব। আর ওকে পৌঁছে দেবেন ওর বাড়িতে।

সোমা কী যেন বলতে গেল, সুমনা চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, থাক্। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।

তা-ই হল। সুমনা নেমে গেল যথাস্থানে। সোমার কাছ থেকে ওর বাড়ির সন্ধানটা জেনে নিয়ে সেই দিকেই গাড়ি ছুটাল চঞ্চল। মুখে কোন কথা নেই, আপন মনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। একসময় পথ ফুরাল, তাকে নামিয়ে দিয়ে তার দেওয়া 'ধন্যবাদ'টুকু শুনল কি শুনল না। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে তীব্রবেগে গেল বেরিয়ে।

পরদিন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত খুব বেশী হতে-না-হতেই এল সুমনা। কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি পরেছে, সাধারণ সাজের মধ্যেও একটা পারিপাট্য লক্ষ্য করা যায়।

ওকে তেমনি একান্তে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুমনা বলল, আমার ব্যাপারে কাল খুব আশ্চর্য হয়েছিলে, না দিদি?

সোমা বললে, তা একটু হয়েছি। কিন্তু শেষটা কী হল? 'হ্যাঁ', না, 'না'?

একটু হেসে সুমনা বলল, আগের কথাটা আগে শোন। সেই যে বলেছিল না, 'অদ্ভুত ফিগার'! 'অদ্ভুত ফোটোজেনিক ফেস্!' সেই কথাই আমার ভিতরটায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল দিদি ভাই।

ভাবলাম, এটুকুই মাত্র আমার আকর্ষণ, এর বেশী কিছু নয়? কেমনতর পুরুষ, যে নারীর দেহটাই দেখে, মনটা দেখে না? পরীক্ষা করতে হবে, সঠিক কী ও দেখেছে! তাই, দুষ্টুমী বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। তোমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম ওর চোখের সামনে। দেখুক ও, ফিগার কাকে বলে, ফোটোজেনিক ফেস্ কাকে বলে?

লজ্জায় মুখখানা মুহূর্তে আরক্ত হয়ে উঠল সোমার, বলল, ছি-ছি! এ কী করলে ভাই! এ জানলে যেতাম না।

—জানি না তোমাকে? সুমনা বলল, জানি বলেই না জানিয়ে নিয়ে গেছি। আমার উদ্দেশ্য তো সাধিত হয়েছে? আজ সন্ধ্যায় কথা দেবার কথা তো, কিন্তু ভোরবেলা গিয়েছিলাম।

—কথা দিতে?

—না, আজে-বাজে কথা বলতে। বলে ওর মনের ভাবটা বুঝে নিতে। তখনও বলছে, 'হ্যাঁ' কি 'না'?

বললাম, অপেক্ষা করুন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

হলও তাই। সন্ধ্যা পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হল ওকে।

জান দিদি, শেষ পর্যন্ত কী হল? রাজী হলাম। দেখলাম, আমার দিকেই ওর ঝোঁক।

সোমা একটু হেসে বলল, তবে? মিথ্যে কতই না ভাবছিলে!

—নেহাতই মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তাই। সুমনা বলল, নেহাতই নারীসুলভ কৌতূহল। যদিও ভেবে দেখলে তার কোনই দরকার ছিল না।

—তার মানে?

—ওর ঝোঁক প্রবল হোক বা না হোক, আমার বিয়ে করাটা লাভের। বাবা-মার অমতেই বিয়ে করছি।—সুমনা বলল, ভেবে দেখলাম, এতে আমার সত্যি সত্যিই লাভ হবে। লোকটি অভিনেতা হলেও হিসেবী, নইলে সিনেমা করে অত টাকা করতে পারত না। দ্বিতীয়ত, একটু-আধটু এদিক-ওদিকের দোষ থাকলেও তা মারাত্মক হয়ে উঠবে না। তৃতীয়ত, লোকটি কেরিয়ার করতে জানে। বাস্তবিকই ওর সময় নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী, ওর সময় নেই বলেই আমি সুখী হব। কেমন সুখী, জানিস দিদি? নরম গদির বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অজস্র বই পড়তে পারব। যে-বই খুশি কিনতে পারব। ও তো বাড়ি থাকবে না, আমার কাছে থাকবে বই। দেশ-বিদেশের যত গল্প আর উপন্যাস। সব কিনব, সব পড়ব,

আর সব শেষ করব। যেগুলো ভাল লাগবে, আবার পড়ব। কেমন, একটা জীবন কেটে যাবে না ?

সুমনা যখন চলে গেল, তখন অনেক রাত। ও চলে গেলে, নিজের ঘরের কোণে একান্তে বসে ভাবতে লাগল সে ওরই কথা। ভালই লাগল ওর বিয়ের কথা শুনে। ভদ্রলোকটি তো দেখতে-শুনতে চমৎকার !

কিন্তু, তবু মনে হল, কোথায় যেন সবার অলক্ষ্যে একটা কান্নার স্রোত বয়ে চলেছে। একটা জীবন কেটে যাবে না ?

সুমনার এ প্রশ্নের মধ্যে অদ্ভুত একটা বিষাদের সুর আছে। আবার, এক ধরনের মুক্তি-কামনাও আছে। চারিদিকের সব-কিছু দেখে-শুনে, ও বুঝি ক্লান্ত। মুক্তি চাইছে।

মিলছে না। তার নিজের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যেন কিছু মিলছে না। কারুর সঙ্গে মিলছে না। সে যা দেখতে চেয়েছিল, এদের দুজনের জীবনেও তা নেই। ভারতবর্ষ বলতে তার মনে যেন আর-এক ছবি, আর-এক রঙ, চিরদিনের মত আঁকা হয়ে আছে।

পাঁচ

সোমার ছোট্ট ঘরখানার তুটি জানলারই পর্দার রঙ সাদা। দরজায় ঝুলছে অন্য সব ঘরের দরজার মত লতা-পাতা-আঁকা রঙীন কাপড়ের পর্দা দর্জীর তৈরী। জানলার পর্দা সে নিজে লাগিয়েছে বেয়ারাকে দিয়ে কাপড় আনিয়ে নিয়ে। মেশিন নেই, নিজের হাতে বসে বসে সেলাই করেছে গোপনে। কিন্তু, তবু তা মনের মত হয় নি। নীচে, ফ্রিল লাগালে হত। হাতের সেলাই, তেমন অভ্যাস নেই বলে সমান-সমান হয় নি। একটা সেলাইয়ের মেশিন পেলে মনের মত পর্দা তৈরি করে নিত সোমা। দরজার পর্দাটিও বদলে সাদা করে নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহসে কুলয় না, মা যদি কিছু মনে করেন !

তবু, তার এই ক্ষুদ্র ঘরখানা যেন তার নিজস্ব এক জগৎ! এখানে শুয়ে-বসে তার নিজের মনের ভাবনাটিকে নিয়ে সে একান্তে কাটাতে পারে। অনেক, অনেক বই তার পড়তে ইচ্ছা করে! কিন্তু তু-একখানা অতি প্রিয় বই ছাড়া অন্য বই সে সঙ্গে করে আনতেই পারে নি! তার টাকাগুলি বাবা নেন নি, তারই নামে ব্যাঙ্কে হিসেব খুলে দিয়েছেন। সেই টাকা থেকে সে কিছু বই কিনে নেবে ? উপনিষদ পড়তে ইচ্ছা করে তার, মিস্টার সিদ্ধান্ত কত করেছেন উপনিষদের গল্প, কিন্তু সংস্কৃত সে শেখে নি! বাঙলাই কি সে ভাল শিখেছে! সুমনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে নিজেই বুঝতে পারে, কথাবার্তায় তার এখনও একটু টান রয়ে গেছে।

কিন্তু, এসব চিন্তাকে ছাপিয়ে যে-চিন্তা তার মনের দিগন্তে

প্রায়শই ভ্রমরকৃষ্ণ ঝড়ের মেঘের মত দেখা দেয় তা হচ্ছে মা বাবার মধ্যে অশান্তির ঘূর্ণি! কী যে হবে, কোথায় যে এর শেষ তা সে কিছুই বুঝতে পারে না! অথচ, ইচ্ছা হয়, সে নিজে কিছু করে, যাতে, সব অশান্তি সব দ্বন্দ্ব নিমেষে মিলিয়ে যায়!

বাবাকে সে বেশী দেখতে পায় না। কিন্তু যে-টুকু দেখে, তাতেই তার পিপাসিত মন তৃপ্ত হয়ে যায়। সেই যে মিস্টার সিদ্ধান্ত বলতেন, 'চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা!'—তার অর্থ যেন এতদিনে সম্যক বুঝতে পারে সোমা। আরও একটা কথা বলতেন সিদ্ধান্ত। বলতেন, 'শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পদ। শোত্রং বাব সম্পৎ!'

বাবার কণ্ঠস্বর যখন দূর থেকে সে শুনতে পেত—মনে হতো—অত্যন্ত সত্যি কথা, শোনবার শক্তি না থাকলে এ-অপূর্ব সম্পদ সে উপভোগ করতে পারত কেমন করে!

সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তায় নিজেই অবাক হয় সোমা। সংস্কৃত শব্দ তো কতই তাকে শুনিয়েছেন মিস্টার সিদ্ধান্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিষয়ও ছিল 'ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য,' কিন্তু অন্য কোন সংস্কৃত ব্যাকাংশ তো তার মনে পড়ছে না, হঠাৎ, 'চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা,' 'শ্রোত্রং বাব সম্পৎ!'—এ-দুটি তার মনে জেগে উঠল কেমন করে? উপনিষদের কথা, কিন্তু কোন্ উপনিষদ? বৃহদারণ্যক, না, ছান্দোগ্য? পড়তে হবে, ভাল করে বুঝতে হবে উপনিষদের বাণী।

নিজের চিন্তায় সেদিন এমন মগ্ন হয়ে ছিল সোমা যে, দরজায় যে এসে কেউ দাঁড়িয়েছেন, তা সে বুঝতে পারে নি। তিনি যে 'আসতে পারি' বলে বাইরে অপেক্ষা করছেন, তা-ও সে জানতে পারে নি।

সাড়া না পেয়ে অবশেষে সরাসরি ঘরে ঢুকেই পড়লেন মিসেস বাতাসারিয়া। বললেন, ডিস্টার্ব করলাম না তো?

—না না, সে কী!—বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের একমাত্র চেয়ারটি এগিয়ে দিল ওঁর দিকে। বলল, বসুন?

—বসছি।

প্রায় চৌষট্টি বছর নাকি বয়স। একটু নুয়ে পড়লেও, শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে নি। এ-দেশের বিধবারা নাকি সাদা কাপড় পরেন, কিন্তু ইনি পরেন হালকা রঙের সব রঙিন পাতলা শাড়ি। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাটা, কিম্বা, উঠে গিয়ে-গিয়ে ঐ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে, বহুলাংশে সাদা, কিন্তু তা বলে তার বাবার মত অত সাদা নয়। গলায় মুক্তোর হার, হাতে মুক্তো-বসান ব্রেস্‌লেট্‌, আর মুক্তো-বসান আংটি।

বললেন, আজ ফিরে যাচ্ছি দিল্লিতে। ওখানে বাড়ি করেছি, একবার যেও এদের সঙ্গে। ওখানে আমার ছেলেরা থাকে, সবাই বড় অফিসার। এই যে সঙ্গে এনেছি আমার ছোট ছেলেকে, দেখেছ নিশ্চয় ? এ-ও আই-এ-এস। আলাপ-সালাপ তো করলে না! আর কার সঙ্গেই বা করলে ? আমার সঙ্গেই বা কথা বললে কতটুকু ? ওই রোজ খাবার টেবিলে যে-টুকু দেখা! তা-ও তুমি এমন মুখ বুজে থেকেছ যে, আমাদের পছন্দ করছ কিনা তা-ও বুঝতে পারি নি!

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল সোমা, আমায় মাপ করবেন, আমার এটা অপরাধ হয়ে গেছে।

অল্প একটু হাসলেন মিসেস বাতাসারিয়া, বললেন, না না, তা কেন। অপরাধ আমাদেরও কম নয়। আমরাই বা তোমাকে কাছে ডেকেছি কতটুকু ?

ওর নত মুখখানির দিকে চেয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার ছোটছেলের কথা। ওর এবার দেখে-শুনে বিয়ে দেব। কিন্তু তুমি এখানে এমন যোগিনীর মত থাক কেন ? নেলীকে তাই বলছিলাম, ও রক্তে ইংরেজ। আমাদের প্রাইড্‌। ওকে সঙ্গে নিয়ে সোসাইটিতে ঘোরাফেরা কর, লোকে দেখুক, আমরা যা তা নই। তা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমাকে আপনজন মনে করে ফ্র্যাংকলি বলবে। তোমার মা কি এখানে আসতে চায় ?

ঠিক এ প্রশ্নটির জন্য এখন প্রস্তুত ছিল না সোমা। একটু চমকেই উঠল মনে মনে। তারপরে একটুক্ষণ সময় নিয়ে ধীর কণ্ঠে বললে, না।

—কেন!

তেমনি ধীর কণ্ঠেই সোমা বললে, এ কেন-র উত্তর সম্ভবত বাবা দিতে পারবেন। আমি পারব কেমন করে?

বৃদ্ধা হাসলেন, হাতটা বাড়িয়ে ওর কাধে রেখে সস্নেহে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে আপন ভাবতে পারছ না; না? শোন, আমি তোমারই অনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, তোমার বাবা কি বিলেতে চলে যেতে পারে বলে তুমি বিশ্বাস কর?

এ-ও আরেক চমক সোমার কাছে। এমন সম্ভাবনার কথা তো কোনদিন মনে হয় নি তার।

ওর কাছ থেকে একটু সরে এসে, একটুক্ষণ থেমে থেকে, একটু চিন্তা করে, তারপর সোমা বললে, না। বাবা যাবেন না।

মিসেস বাতাসারিয়া এবারেও একটু হাসলেন, বললেন,—অত জোর করে কথাটা বলো না। আরও একটু ভেবে বল।

ভাববার অত কী আছে! সোমা বলল,—আমার মাকে তো আমি জানি। বাবা যদি সত্যিই কোনওদিন যান তো মার দেখা পাবেন না। মা খবর শুনে আরও দূরে পালিয়ে যাবেন।

—হুঁ। আমিও তাই অনুমান করছি।—বৃদ্ধা একটু থেমে, তারপরে বললেন, পেয়েছি আমার সব প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ দুজনেই দুজনকে আর কখনও কাছে পেতে চাইবে না। কিন্তু, তোমার বাবার কথা খানিকটা বুঝি। বুঝি না তোমার মায়ের কথা।

কেন?

বৃদ্ধা বললেন, তোমার মা তোমার বাবার সঙ্গে আসতে চাইলেন না কেন ইণ্ডিয়ায়? বলতে পারো?

সোমা ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, বোধ হয় পারি দিদিমা। মা ভেবেছিল, বাবার সঙ্গে

ভারতবর্ষে এলে বাবার সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এ-রকম বহু কাহিনী শোনা গেছে। যারা এমনভাবে এদেশে এসেছে, তাদের অনেকেরই জীবন সুখের হয় নি। তাছাড়া, আমার বাবার মধ্যে আমার মা এমন-একটা-কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, যা তাকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। এক কথায়, মা যেন বাবার মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, কথাটা তো বুঝলাম না সোমা!

স্বল্পবাক মেয়েটির নিরুদ্ধ চিন্তার দ্বার যেন অর্গলমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যা ছিল তার অহোরাত্রের চিন্তার বিষয়, ঠিক সেই-খানেই অতর্কিতে বুঝি নাড়া দিয়েছিলেন বৃদ্ধাটি এসে!

তাই, সোমা যেন অন্য কাউকে কিছু বলছে না, নিজের কথা নিজেকেই শোনাচ্ছে!

সমান আবেগেই বলে যেতে লাগল, দেখুন, কথাটা আমার পক্ষে আপনাকে বোঝানও শক্ত। তবে বাবাকে দেখে আমারও এমন একটা কিছু মনে হয়। লণ্ডনে মার কাছে বসে, মাকে দেখে, দিনের পর দিন অবাকই হয়েছি! বুঝতে চেষ্টা করেছি মার সাধনাকে! কী এমন ঐশ্বর্য মা পেয়েছেন তাঁর মনের মধ্যে, যার জোরে তিনি তাঁর চার-পাশের সব-কিছু প্রলোভনকে জয় করেছেন অমনভাবে? কী সে সম্পদ? তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদের সংবাদ জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম এদেশে। এসে বাবাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। মনে হচ্ছে, ওঁর মধ্যে বুঝি বাস করছেন এক তপস্বী, যাঁর বাইরের কোনও দিকে দৃকপাত নেই, অন্তর-রাজ্যের কী এক নিগূঢ় রত্নের সন্ধানে উনি অনুক্ষণ ব্যস্ত।

বৃদ্ধা বললেন, এ-ও বুঝলাম না। কথা হচ্ছে, ওঁকে যদি সত্যিই চিনে থাকেন তোমার মা, তার সঙ্গে তাঁর না-আসার সম্পর্কটা কী?

সোমা ধীর কণ্ঠে বললে, বোধহয় উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার চেষ্টা করছেন একা-একা আজ পঁচিশ বছর। বুঝতে চেষ্টা করছেন, ভারতবর্ষের খাঁটি ভারতীয় মানুষ কিসের ধ্যান করে, কী সে চায় শেষ পর্যন্ত ? মা যে বাবাকে ভালবেসেছিলেন গভীরভাবে !

অস্থির হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা, থাম, থাম, এসব আমি সত্যিই বুঝতে পারব না।

সোমা কোমলকণ্ঠে বললে, কেন পারবেন না দিদিমা ? আপনাদের রামায়ণেই ত আছে শবরীর প্রতীক্ষার মতো নারীর কথা।

ওর মুখের দিকে একটু অবাক হয়েই এবার তাকালেন বৃদ্ধা, তারপর বললেন, তোমার মা-ও কি শবরীর মত তাঁর রামচন্দ্রের প্রতীক্ষা করছেন নাকি ?

সোমা এবারে একটু হাসল। বলল, না। শবরীর মনের গঠনের সঙ্গে মায়ের তুলনাটা করলাম শুধু।

বৃদ্ধা বলে উঠলেন, আসল কথা, সে আর আসছে না তো ? বাস্, ম্যাটার ইজ্ ইজি। নেলী তোমাকে গ্রহণ করুক, আর তারপর রটিয়ে দিলেই হবে যে, সোমার আসল ইয়োরোপীয়ান মা মারা গেছে !

—মারা গেছে !

বৃদ্ধা উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। তারপরে, ঘরের রঙিন পর্দা সরিয়ে চলেও গেলেন।

কিন্তু সোমার মনের মধ্যে বারবার ঘুরতে লাগল একটি নিষ্ঠুর বাক্য—মারা গেছে ! মারা গেছে তার মা !

কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর।

—নমস্কার। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। বেড়াতে বেরোন নি বুঝি কদিন ?

সেই ক্যানেলের ধার। বিকেলবেলা। আর সেই চশমা-পরা লোকটি।

মানুষের মন সত্যিই এক আশ্চর্য বস্তু। কয়েকটা-দিন ধরে নিজের চিন্তায় এমনই মগ্ন ছিল সোমা যে, আজ বেড়াতে বেরিয়ে ক্যানেলের-ধার পর্যন্ত এসেও তার জের মেটে নি। এমনই আত্ম-মগ্নতার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ বিরক্তিরই সঞ্চার করে। কিন্তু, আজ ঘটলো ঠিক তার বিপরীত। নিজেকে নিয়ে নিরন্তর হাঁপিয়ে ওঠার মধ্যে এই অদ্ভুত লোকটির উপস্থিতি যেন হঠাৎ-ই এক মুক্তির আস্বাদ নিয়ে এল।

ওর প্রশ্নের উত্তর সোমা তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই দিতে পারল—কদিন বেড়াই নি ঠিকই। শরীরটা ভাল ছিল না।

—ও। লোকটি একটু থেমে মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে তারপর আবার মুখ তুলে বলে উঠল, আপনার দিল্লির সেই দিদিমাও তো চলে গেলেন কাল!

—আপনি জানলেন কী করে?

আশ্চর্য হয়ে লোকটি বললে, কেন! আমার বউদি! স-ব সে জানে।

সোমা বলে ফেলল, চলুন তো আপনার বউদির কাছে। তিনি কেমন স-ব জানেন, জেনে আসি?

যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না ওর কথা! অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর চমক ভেঙে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, আসবেন আপনি আমাদের বাড়িতে!

—কেন নয়?

লোকটি অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, নিশ্চয়ই। আসুন, আসুন।

বাড়িটা তো তার জানলা দিয়েই বেশ দেখা যেত। কিন্তু ঠিক যে এতটা নোংরা-নোংরা, এতটা অন্ধকার, তা সে দূর থেকে ভাবতে পারে নি। যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হয়ে ওদের বাড়ির অংশে পৌঁছতে হল। কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, গলা ঠেলে বমি আসতে চাইছিল যেন!

লোকটি বলেছিল, সাবধানে আসবেন। আমাকে লক্ষ্য করে। এখানে একটু অন্ধকার।

অন্ধকার একটু! অতি কষ্টে প্রায় হাতড়ে হাতড়েই সোমা এসে পৌঁছল ওদের দুয়ারে।

এদিকটা বেশ খোলামেলা। উঠোনের একটু অংশ প্রথমেই চোখে পড়ল, বেশ পরিষ্কার—ঝকঝকে।

—বউদি, বউদি?

লোকটি ডেকে উঠতেই এক ভদ্রমহিলা উঠোনের অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিয়ে উঠলেন।

—এদিকে এস। কে এসেছে দেখ।

—কে?

বাইরে এসে সোমাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রমহিলা থমকে দাঁড়ালেন সুকঠিন বিস্ময়ে।

কিন্তু একমুহূর্ত মাত্র। তারপরেই স্মিতহাস্যে ভরে গেল তার মুখ, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে হাত ধরলেন সোমার। সাগ্রহে বললেন, আসুন ভাই, আসুন?

বলে সামনের ঘরখানার মধ্যে টেনে নিয়ে এলেন তাকে। টেবিলের সামনেকার চেয়ারটা টেনে বসতে দিলেন।

বসামাত্রই জানলায় চোখ পড়ল সোমার। মুখ তুলে ওপরে তাকাতেই তার ঘরের জানলাটি চোখে পড়ে, যে জানলার সাদা পর্দাটা সরিয়ে প্রতিদিন ভোরে সে সূর্যপ্রণাম করে।

তাহলে এই ঘরটিই হচ্ছে ওই ভদ্রলোকের ঘর। ইস! কত বই সব টেবিলে! কী বই এগুলো? হাত দেবে নাকি একবার?

না। কেমন একটা সংকোচ এল যেন মনে। ওদিকে বউদি কিন্তু তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। দোহারা চেহারার মোটা-মুটি সুশ্রী চেহারা, মুখের হাসিটি ভারী মিষ্টি, ভারী চমৎকার। ওর হাতটা ধরে বলে উঠলেন, কি রূপবতী মেয়ে গো আপনি! আমি নীচে থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখি, আর চোখ

ফেরাতে পারি না! তা আমার এই পাগল দেওরটির সঙ্গে আলাপ হল কী করে?

'রূপ'-এর উল্লেখে ভয়ানক লজ্জা করছিল সোমার। চট করে কোন উত্তর সে দিতে পারল না, চুপ করে রইল। বছর দশেকের আর বছর ছয়েকের দুটি ছেলে বোধহয় বউদির। তারা বাড়িতে নতুন মানুষ দেখে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল বুঝি। বউদি এগিয়ে গিয়ে তাদের সরিয়ে দিলেন দরজা থেকে। তারপরে শাড়ির আঁচলে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে নিতে নিতে ওর কাছে এসে আবার বসলেন বউদি।

কিন্তু তখনই চোখে পড়ল, সোমাকে বউদির হাতে সমর্পণ করে ঘর থেকে বহুক্ষণ হল উধাও হয়েছে তার দেওরটি।

বউদি বলে উঠলেন, ওমা, পাগলটা আবার গেল কোথায়! ঠকুরপো? ও ঠাকুরপো?

অনতিদূর থেকে সাড়া এল, আমি রান্নাঘরে বউদি। চা করছি।

হেসে উঠলেন বউদি, বললেন, ওমা কোথায় যাব গো!

বলেই কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলে তাঁর দেওরের উদ্দেশে বললেন, কোনওদিন তো রান্নাঘরে ঢোক না, আজ হাত-পা পুড়িয়ে জ্বলবে নাকি! চা খাওয়াবার শখ হয়েছে তো আমায় বললে না কেন!

কী যে উত্তর ভেসে এল, ঠিক বোঝা গেল না। বউদি ওকে এবার বললেন, হ্যাঁ ভাই, চা খাবে আমাদের বাড়িতে?

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে অদ্ভুত এক কৌতুক অনুভব করছিল সোমা, তাই কী মনে করে যেন সে বলে ফেলল, খাব।

—ওমা! ওই দেখ, তোমাকে 'তুমি' বলে ফেললাম।

চট করে ওঁর হাতটি ধরে সোমা বলে উঠল, আমাকে 'তুমি' করেই বলবেন!

—বলব? মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল দেখাল বউদির। তিনি একটু থেমে তারপর বললেন, কিন্তু একতরফা 'তুমি' হলে ভাব জমে না। তোমাকেও 'তুমি' করে বলতে হবে। কেমন? কই বল?

সোমা হেসে ফেলল, বলল, বেশ, তাই বলব বউদি, কথা দিচ্ছি।

—বউদি বললে তুমি আমাকে! অদ্ভুত সরল মনে হল মহিলাটিকে, তিনি আনন্দে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন বলা চলে। বললেন, তোমারও বউদি আমি! কী চমৎকার!···দাঁড়াও আসছি।

চলে গেলেন বউদি।

ধীরে ধীরে ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যা আসন্ন। একা থাকতে থাকতে স্বভাবতই টেবিলের বইগুলির দিকে আবার মন গেল সোমার। একটুক্ষণ ইতস্তত করে একখানা বই সে হাতে টেনেই নিল। পাতা ওলটাল। অন্ধকারে অক্ষরগুলো ভাল করে পড়া যাচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছে, একখানি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের বই। প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে বইয়ের মালিকের নাম লেখা। চুপি চুপি সেটা পড়ে নিতে চেষ্টা করল সোমা।

একটু পরেই বাইরে পদশব্দ। তাড়াতাড়ি বইটা মুড়ে রাখল সে।

এল সেই লোকটি। এসে দেয়ালের সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

সোমার মনটা কিন্তু এক আশ্চর্য আন্তরিকতার সুরে ভরে গেছে! বউদির সাহচর্যে তার মনের সমস্ত ভাবনার মেঘ যেন কোথাও উধাও হয়ে গেছে! স্বচ্ছ মনের সান্ধ্যআকাশে খুশির তারাগুলি একে-একে ফুটে ফুটে উঠছে বুঝি!

আর তা-ছাড়া, কোথায় যেন নিজের শৈশবের সেই দারিদ্র্যভরা দিনগুলির সঙ্গে এ-সংসারের একটা মিল খুঁজে পেয়েছে সোমা! এখানে বসে, এখন সে তাই একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না, কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না একটুও অসঙ্গতি।

খুশি মনেই মুখ তুলে তার দিকে তাকাল সোমা, বলল, বউদি তো আখ্যা দিল 'পাগল।' আসল নামটা কী?

—ওটাই আসল নাম, লোকটি একটু হেসে বললে, পাগলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হাতের যে বইটি টেবিলে ততক্ষণে রেখে দিয়েছিল সোমা, সেটি আবার চট করে তুলে নিল হাতে, তারপরে, প্রথম পৃষ্ঠাটি বার করে যেখানে মালিকের নাম লেখা রয়েছে, সে স্থানটির দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠল, মিথ্যে কথা। মহেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বলুন, ঠিক কি না ?

—না। লোকটি বললে, আমি কোনও ঈশ্বর-টিশ্বর নই। ও আমার দাদার নাম। এ সবই দাদার বই। দাদা অধ্যাপনা করেন তো ? আমি তাঁর বই আমার টেবিলে টেনে নিয়ে এসে কাঠঠোকরার মত ঠুকঠুক করি মাত্র।

সোমা আবার তাকাল ওর মুখের দিকে, বলল, সত্যি, বলবেন না তো নাম ! দেখি খাতাটাতাগুলো ?

টেবিলের অপর প্রান্তে ছিল কতগুলি খাতাপত্র। হাত বাড়িয়ে সেগুলি টেনে নিয়ে দেখবার আগেই সে এসে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ধরতে গেল খাতাগুলি। কিন্তু খাতা নয়, যা সে চেপে ধরল অতর্কিতে, তা হল সোমারই একখানা হাত।

মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়ে লোকটি বললে অদ্ভুত গম্ভীর গলায়, নাম-ধাম না জানাই ভাল। দাদার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চের একটা কাজ পেয়েছি, অত্যন্ত সাধারণ লোক, অত্যন্ত গরীব লোক আমি। যদি বলেন, আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গেলাম কেন ? তাহলে, সত্যি কথাই বলব, একটা লোভ হয়েছিল !

অস্ফুটকণ্ঠে সোমা বলে উঠল, কী লোভ !

লোকটি একটু থেমে তারপরে বললে, বিলেত সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব-কিছু জানবার লোভ। আমার একটা ধারণা, মানুষ সর্বদেশে সর্বকালেই এক। শুধু চেহারাটা আলাদা, পোশাক-আশাক, আহার-বিহারটাই ভিন্ন। এই ধারণাটা যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলাম মাত্র।

ওর কথা শেষ হওয়ার পরও কয়েকমুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে

ছিল সোমা। এ যেন অন্যজগতের, অন্য এক সুর এসে বাজছে মনে! লোকটিকে সে যতদূর জেনেছিল এর মধ্যে, সেই ধারণার সঙ্গে, এ যা এখন সে শুনছে, এর মিল নেই। আবার কোথায় যেন মিল আছেও।

আছে বলেই ভাল লাগছে। চোখ নামাল সোমা, অল্প একটু হেসে বলল, তা বেশ তো! লোভটা মিটিয়ে নিন। কিন্তু তাতেই বা নাম-না-জানতে-দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? হানি হচ্ছে কোথায় বন্ধুত্বের?

—হানি হচ্ছে! হঠাৎ সে কণ্ঠে কেমন আরও গাম্ভীর্য, আরও দৃঢ়তা এনে বলে উঠল, আপনি আমার ঘরে এলেন, এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও আমি বুঝতে পারছি। এখন দেখছি, নিছক বন্ধুত্বই আমি কামনা করি নি!

বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল সোমার, বললে, তবে? কীসের কামনা?

সে বললে, সে আরেকদিন বলব। আজ আপনি অতিথি।

সোমা উঠে দাঁড়াল, বললে, তা হোক, আপনি বলুন!

মুখ তুলল লোকটি, সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, দয়া করুন আপনি। সে কথা বলতে বলবেন না আমাকে!

বলেই আর দাঁড়াল না, চট করে সরে গেল ঘর থেকে।

আর পরক্ষণেই ঘরে এসে ঢুকলেন বউদি—ঝকঝকে একটা কাপে করে এককাপ চা নিয়ে।

সোমা চা খেতে-খেতে গল্পচ্ছলেই একসময় বলে উঠল, আপনার পাগল দেওরটির নাম কী, বউদি?

—ওমা, তা-ও জান না? কী আলাপ হল তাহলে?

এ-কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোমা একটু আবদারের স্বরেই বলে উঠল, আপনি বলুন?

বউদি বললেন, অনুপম। শখ করে নাম রেখেছিল নাকি তোমার দাদা। বাপ-মা কেউ বেঁচে নেই, এই দুই ভাই। কিন্তু বড় ভাল এরা। বলতে পার দুই পাগল নিয়ে আমি ঘর করছি।

বউদির চোখ-মুখ অদ্ভুত এক স্নেহের আভায় ঝলমল করে উঠল

বাড়ি ফিরে এল সোমা। মা কোথায় বেরিয়েছেন। বাবাও বাড়ি নেই। ধীর পায়ে নিজের ঘরে এসে বসল সোমা। এটা-ওটা কত-কী কাজ করল। তারপরে একসময় কি ভেবে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল চুপিচুপি। পর্দার আড়ালে এমন ভাবে দাঁড়াল, যাতে, বাইরে থেকে কেউ না টের পায় ওর উপস্থিতি।

নীচে সেই ওদের ঘর। টেবিলের সামনে বসে আছে অনুপম। কিছুই করছে না সে, চুপচাপ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে!

দেখতে দেখতে হঠাৎ হাসি পেল সোমার। ইচ্ছে হল, বিছানায় পড়ে প্রাণভরে সে হাসে। কিন্তু পরক্ষণেই শাসন করল সে নিজেকে। ছিঃ! অনর্থক এ হাসির উচ্ছ্বাসের কি কোনও অর্থ হয়?

পরদিন দেখা হল না।

দেখা হল তারও পরদিন। সেই বিকেলবেলা। সেই ক্যানেলের ধারে। লোকটি বললে, লোকগুলি মাটি কেটে নতুন জল আনছে ক্যানেলে। কত লোক, না?

সোমা বললে, আজ হঠাৎ ওদের দিকে চোখ পড়ল যে?

—পড়ে! লোকটি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে, ওদের মাটি কাটার মধ্যেও একটা পদ্ধতি আছে—শ্রী আছে, তাই না?

সোমা কিন্তু সে-কথা কানে নিল না। সে একটু হেসে তাকে বললে, নামটা কিন্তু জেনেছি।

—কার!

—বলুন তো কার?

বুঝতে পেরে অনুপম একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললে, আমাকে মার্জনা

করবেন। সেদিন ও আচরণ করাটা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। নাম না বলে অভদ্রতাই করেছি।

—তাই নাকি? সোমা সকৌতুকে বললে, ভবিষ্যতে করবেন না যেন।

যেখানটায় ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সে জায়গাটা বিশালকায় একটা জাম-গাছের নীচে। জলধারার একেবারে প্রান্তে। প্রবল বৃষ্টিধারার ফলেই সম্ভবত একদিন মাটি ধুয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড শিকড়সুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। ঘুরে-ফিরে এইখানেই বেড়াতে আসত সোমা সেই প্রথম দিনটি থেকে। ঠিক সামনেই ক্যানেলের জল, আর ঝাঁকড়া-মাথা এই মহীরুহটি। কত পাখি নিশ্চিন্তে এসে কলরব করে আসন্ন সন্ধ্যার মুহূর্তে, কিন্তু প্রবল ঝড়ে যদি এই গাছটি একদিন ভেঙে পড়ে, যদি ভেসে যায় ওই জলস্রোতের উপর দিয়ে?

কেন কে জানে, এখানে এসে দাঁড়ালেই এ-চিন্তা অধিকার করত সোমার মন। নানান স্বুরের নানান ভাবনা, সঙ্গে সঙ্গে এই এক অদ্ভুত ভাবনাও গুনগুন করে উঠত মনের মধ্যে।

অনুপমের যাতায়াতের পথও এই জাম-গাছটি ছুঁয়ে। এ-পথ ঘাসের-বুকে-জেগে-ওঠা পায়ে-চলা পথ। হয়ত অনুপমের চলাতেই এর সৃষ্টি হয়েছে, কে বলতে পারে? কারণ অন্য কাউকে তো বড় একটা দেখা যায় না এই পথ দিয়ে চলতে!

ওদের বাড়িতে প্রবেশ করার সাধারণ রাস্তা অন্যদিকে, খোয়া-বাঁধান সরু গলি, গ্যাসের আলো সমন্বিত। ও বলে, সব কথাই তো সব লোকের জানা। এই, এইটুকু পথ ছিল একান্ত আমার। কে জানত, একদিন এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে!

সোমা হেসে ফেলল, বলল, এখন আবির্ভাব বলে মনে হচ্ছে, পরে মনে হবে, বিঘ্ন। তখন ভাববেন, কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল এই আপদ!

দু চোখ বিস্ফারিত করে অনুপম শুনছিল ওর কথা, তাড়াতাড়ি

বলে উঠল, এ যে একেবারে বাঙালী মেয়েদের মত বাক্যালাপ শুরু করলেন আপনি!

—কী আশ্চর্য, আমি কি বাঙালী নই? সোমা বললে, ভাবেন কি আমাকে আপনি?

বলেই, ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সোমা বলে উঠল, নিন, চলুন বাড়ি যাই। দেখা করে আসি বউদির সঙ্গে। সত্যিই, আপনার বউদি অতি চমৎকার লোক!

শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনুপমের মুখখানা, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে, কেমন, তাই না! আমি বলি নি আপনাকে!

সত্যি সোমাদেবী, বউদির মত দরদী মানুষ আর হয় না! কিন্তু, একদিনমাত্র আলাপ করে চিনলেন কী করে আপনি!

—সে আপনি বুঝবেন না! নিন, চলুন।

সত্যিই এ-কথা বোঝান দুষ্কর। ওদের বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে কোথায় যেন নিজের মানসিকতার একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পায় সোমা। এই-যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ করছে, এর সঙ্গে তার ফেলে-আসা সংগ্রামশীল জীবনের এক অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে যেন!

একটা সেলাইয়ের হাত-মেসিন তার শোবার ঘরের খাটের ওপর উঠিয়ে নিয়ে কী যেন সেলাই করছিল বউদি, একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে উপস্থিত করল অনুপম।

সোমা বললে, সেলাইয়ের মেশিন আছে? ভালই হল। কাল দুপুরে আসব, আমার জানলার নতুন পর্দাটা সেলাই করা দরকার!

বউদি হেসে বললেন, তার চেয়ে মেশিন একটা বাবাকে বলে কিনেই নাও না। সত্যি ভাই, কথায়-কথায় দর্জী ডাকা কি আমাদের চলে?

অনুপম ততক্ষণে সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। সোমা বললে, মেশিন থাকলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু বাবাকে বলতে আমি পারব না। মা কি মনে করবেন?

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বউদি সেলাই-পর্ব শেষ করে সোমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, চল ভাই ও-ঘরে। ঠাকুরপো আবার গেল কোথায় ?

সেদিনের মত কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সোমা চলে এল। পরদিন দুপুরে সত্যিই সেলাই করতে এল সোমা। অনুপম আর অনুপমের দাদা কলেজে। মনের মত করে পর্দা সেলাই করতে করতে বারবার বাবার কথা মনে পড়ছিল সোমার। মা ঘুমুচ্ছেন তাঁর ঘরে, দেখে এসেছে। কিন্তু বাবা ? বই পড়ছেন একমনে। কিন্তু যদি ডেকে পাঠান সোমাকে ? কখনও ডাকেন না। আজ-কাল সোমাকে তাঁর দরকারও হয় বুঝি কম। শুধু খাবার টেবিলে দেখা হয়। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য। সামান্য কথাবার্তাও হয়। কিন্তু সে-ও কতটুকু ? অন্যসময় ডাকাডাকি করেন না বটে, কিন্তু বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করে যখন সোমা, দুটি চোখ তাকে অনুসরণ করে, তা সে বেশ বুঝতে পারে। সম্ভবত মার জন্যই তাকে বাবা কাছে ডাকেন না, অথচ ডাকবার জন্য মন তাঁর নিশ্চয়ই ছটফট করে। তার নিজের মনও যে চায় তাঁর কাছে অনুক্ষণ থাকতে। কিন্তু মা তা পছন্দ করবেন না বলেই সে দূরে থাকে।

অথচ আজ এদের বাড়িতে এসে মন পড়ে রইল ও বাড়িতে। বাবা কখনও ডাকেন না দুপুরের দিকে, কিন্তু যদি ডাকেন ? যদি আসে সে আহ্বানের স্বর্ণমুহূর্তটুকু ?

তাই স্থির হয়ে বেশীক্ষণ বসতে পারলে না সোমা। কত কী কথা বলতে লাগল বউদি, কত কী প্রশ্ন! সবই সে 'হুঁ' 'হাঁ' করে কোনক্রমে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। বউদি কিছুক্ষণ ধরে এটা লক্ষ্য করার পর অবশেষে মুচকি হেসে বললেন,—মন টিকছে না দেখছি।

—না-না, তা কেন!

—আর তা কেন। বউদি বললে,—ব্যাপারটা বুঝেছি।

—কী ব্যাপার ?

বউদি মুখ টিপে হেসে বললে, সে পরে একদিন বলব'খন। আজ নয়।

কিছুক্ষণ পরেই চলে এল সোমা। আয়াকে জিজ্ঞাসা করে জানল, বাবা তাকে ডাকেন নি। কেউই খোঁজ করে নি। জানলার একটা পর্দা পুরনো হয়ে গিয়েছিল। পুরনোটা বদলে নতুনটা লাগাতে-লাগাতে ওদের উঠোনের দিকে তাকাল সোমা। ভারী পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে উঠোনটা। বেদী বাঁধানো তুলসী গাছটাও অপূর্ব শান্তির দ্যোতক বলে মনে হচ্ছে। বউদি বোধহয় ঘরে। মনের আনন্দে হাতের টুকিটাকি কাজ করে চলেছে।

হঠাৎ মনে হল, বউদি কী যেন বলতে চেয়েছিল তাকে। কী যেন একটা অনুমানও করেছে বউদি!

কিন্তু, কী সে অনুমান? তার বাবার প্রতি তার আকর্ষণ? অথবা বাবা-মায়ের মধ্যেকার বিরোধ?

আর নয়ত—? চিন্তাটা মনে আসতেই সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল সোমার। তবে কি অনুপমকে নিয়ে তার সম্বন্ধে কিছু মনে করে বসে আছে বউদি?

অনুপমও যেন তাকে একদিন কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল, আর বলে নি।

কিন্তু ও যে অন্য কিছু নয়, মাত্র কৌতূহল। ওদের জীবনধারার মধ্যে কোথায় যেন মিল পেয়েছে তার স্বপ্ন।

যে-বাড়িতে সে আছে, সে তো তাদের বিলাতী সমাজেরই প্রতিচ্ছবি বলা যায়। নিজস্ব ভারতীয় জীবনধারার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার রূপ সেখানে কোথায়?

একমাত্র তার বাবার মনে জেগে আছে তার স্বপ্নের ভারত, আর জেগে আছে মনে হয় এদের মধ্যেও। অনুপমের সারল্য তাকে মুগ্ধ করে, অনুপমের চরিত্র-মাধুর্য তাকে আকর্ষণও করে। কিন্তু তারপর?

দু দিন পরের ঘটনা।

দেখা হতে একথা-সেকথার পর অনুপম হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব?

—কী?

অনুপম বললে, আপনার নামটার এক ইতিহাস আছে। জানেন?

আশ্চর্য হয়ে সোমা বললে, না তো! কেউ বলে নি তো কখনও!

অনুপম বললে, বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের থেরী বলত। গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক থেরীর নাম ছিল—সোমা। মহারাজ বিম্বিসার সে যুগের এক মহান রাজা। তাঁর পুরোহিতের কন্যা ছিলেন সোমা। বড় হয়ে তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যা হন। পরে ভিক্ষুনীব্রত গ্রহণ করে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। ওঁর সম্বন্ধে গল্প আছে কি জানেন? তপস্যায় যারা বাধা সৃষ্টি করত, তাদের বলত, 'মার'। এই 'মার' একদিন তাকে এসে বলেছিল, ঋষিরা যে সত্যজ্ঞান আর দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারেন, নারী হয়ে তুমি তা পারবে কী করে তোমার দুই আঙুল পরিমিত জ্ঞান দিয়ে?

—দুই আঙুল পরিমিত জ্ঞান মানে?

—শুনুন। ভাত রান্না করা দেখেছেন? সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে মেয়েরাই তো রান্না করে? যে-মেয়েরা আট-নয় বছর থেকে শুরু করে সারাজীবন ভাত রান্নায় অভ্যস্ত হল, সে-ও জানে না, হাঁড়ির চাল কখন সিদ্ধ হল। সেটা জানবার জন্য দু-একটা চাল হাতায় উঠিয়ে দুই আঙুল দিয়ে টিপে দেখতে হয়। এইজন্যই 'মার' বলছে, 'দুই আঙুল পরিমিত জ্ঞান।'

সোমা হেসে ফেললে, বললে, কী উত্তর দিয়েছিল সোমা?

অনুপম বললে, সোমা বলেছিল, চিত্ত যাদের সমাহিত, অন্তর্দৃষ্টি যাদের হয়েছে, স্ত্রী-স্বভাব তাদের কী করতে পারে? ওর এসব কথা শুনতে শুনতে সোমার হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার মা-ই তার নাম রেখেছিল সোমা। মা কি জানতো এই গল্পটা?

বোধহয় জানতো। বোধহয় মায়েরও চিত্ত হয়েছে সমাহিত, অন্তর্দৃষ্টি হয়েছে মায়ের, তাই স্ত্রী-স্বভাব মাকে একটুও টলাতে পারে নি।

সোমা বললে, আমাকে কিছু বই দেবেন? আমি অনেক—অনেক পড়ব। আমি বাংলা যতটা বলতে পারি, পড়তে হয়তো ততটা পারব না, আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কেন করব না! অনুপম বললে, কিন্তু একটি শর্তে। আমাকে ইংরাজিটা ভাল করে শেখাবেন? অমন করে তাকাবেন না! যেটুকু ইংরাজি আমরা শিখি, তা খুব পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যেক চলিত ভাষাই হচ্ছে জীবন্ত, দিনে-দিনে তার রূপ বদলে যায়। আমরা যে ইংরাজি শিখি, তা যুগের সঙ্গে তাল-রাখা আধুনিক ইংরাজি নয়। বুঝলেন?

সোমা একটু হেসে বললে, বেশ, তাই।

অনুপম বললে, কিন্তু আমি আপনার বাড়ি যাব না। আপনাকে আসতে হবে আমাদের বাড়ি।

মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাল সোমা, একমুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, এ কথা বলছেন কেন!

অনুপম কথাটা জোর দিয়ে বলেই বোধহয় অপ্রস্তুত বোধ করেছিল মনে মনে, তাই প্রসঙ্গটার গুরুত্ব লাঘব করার জন্যই বলে উঠল হালকা সুরে, অত গুরুতর-হিসাবে নিচ্ছেন কেন ব্যাপারটা! ডাকুন না—চা খেতে ডাকুন—নিশ্চয় যাব। কিন্তু কী জানেন, নিয়মিত যাওয়া মানে—ও-বাড়ির সঙ্গে কি আমাদের বাড়ির খাপ খায়? কেমন যেন মন সায় দেয় না! সত্যি বলছি!

কেমন যেন অসংলগ্ন—থেমে-থেমে কথাগুলো বলা! সোমা বললে, কিন্তু আমি ত ও-বাড়িরই মেয়ে!

অনুপম বলে উঠল, তা ঠিক, কিন্তু ওই বাড়ির আবহাওয়া আপনাকে গ্রাস করতে পারে নি! আপনি যেন ওদের-জাতের মেয়ে নন, আপনি আমাদের জাতের। আপনার কাছে সহজ

হওয়া যায়। যদিও ভেবে দেখতে গেলে, আপনি মেমসাহেব, আপনার কাছ থেকে আমাদের থাকার কথা অনেক—অনেক দূরে!

গাম্ভীর্যের মধ্যেও হাসি জেগে উঠল ঠোঁটের কোণে। সোমা অল্প একটু হেসে বললে, তাই থাকলেন না কেন?

এ প্রশ্নে হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে গেল অনুপম, কোন উত্তর দিল না।

সোমা একটুক্ষণ ওর উত্তরের অপেক্ষা করে তারপর প্রসঙ্গান্তরে আসবার উদ্দেশে পূর্বকথার জের টেনে বলে উঠল, কিন্তু জাতের কথা কী বলছিলেন?

—মাপ করবেন। অনুপম বললে, কথাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নি। আমার মতে সংসারে দু-জাতের লোক আছে।

সোমা বললে, সে ত পুরনো কথা, ধনী আর দরিদ্র, এই ত?

—না, অনুপম বললে, আমি সেভাবে বিচার করি না, আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। আমার মতে সংসারের মানুষ দু ধরনের। এক-যারা বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে চালিত করে, আর যারা হৃদয় দিয়ে জীবনকে চালিত করে। এককথায় বুদ্ধি-আশ্রয়ী, আর হৃদয়-আশ্রয়ী। আমি আপনাকে দ্বিতীয় দলে ফেলব।

ওর চিন্তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল সোমা। বললে, কেমন করে বুঝলেন?

—না হলে কী আর এমন করে বিলেতের মেয়ে হয়ে ছুটে আসতেন এদেশে? বিলেতিয়ানা সব ছেড়ে ছুড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন বাঙালী হবার?

সোমা প্রশ্ন করে বসল, এইটাই বুঝি আপনাদের চোখে পড়ে?

ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অনুপম বললে, চোখে পড়ে অনেক-কিছু। কিন্তু সেকথা বলার সময় এখনও আসে নি।

ওর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে কেমন যেন গাঢ় শোনায়। তারই ছোঁয়ায় সোমা বুঝি অতর্কিতে বলে ওঠে ততোধিক গাঢ় কণ্ঠে, কেন আসে নি?

উত্তর দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল অনুপম।

সোমাও যেন ফিরে পেল সংবিৎ। অস্বস্তিকর অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতেই সে বলে, তাহলে কথাটা কী দাঁড়াল? আমি যাব আপনাদের বাড়ি, আপনি আসবেন না, এই তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না আপনি!

কথাটা ওর মত মনোভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বরং একদিক থেকে দেখতে গেলে, ওর পক্ষে ঘন ঘন না যাওয়াই ভাল। ওকে দেখে মা আবার কী মনে করবেন কে জানে!

এখানে বিকেলে যখন জামগাছটার তলায় এসে ওরা দাঁড়ায়, ওদের বাড়ি থেকে দেখা যায় না, আর এ জায়গাটা আশ্চর্য নির্জন! শুধু ক্যানেলের মাটি-কাটা লোকগুলি আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে। কখনও চোখ তুলে কেউ কেউ তাকায়, কেউ কেউ তাকায় না। যেন ব্যাপারটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে!

কিন্তু বাবা যদি তাদের তুজনকে কখনও এভাবে দেখেন? কী মনে করবেন?

চিন্তাটা কখনও মনে আসে নি সোমার। এখন মনে হতে বিরুদ্ধ চিন্তা আসছে না। মনে হচ্ছে, মা রাগ করতে পারেন, কিন্তু বাবা কখনও রাগ করবেন না। এ লোকটি তার বাবাকে চেনে নি। ওর মত জাত-বিভাগ যদি করতেই হয় তো তার বাবাও হৃদয়াশ্রয়ী ব্যক্তি। অনেক বড় হৃদয় নিয়ে তপস্বীর মত একক বাস করছেন তার বাবা, সে খবর কেউ জানে না, জানে শুধু তার মন!

তার বাবার সঙ্গে, আশ্চর্যের কথা, এতক্ষণে মনে হল—এই লোকটিরও কোথায় যেন মিল আছে! বাবার সঙ্গে কথা বলে ও নিশ্চয়ই খুশী হবে! কিন্তু ও যে যেতে চায় না। মনে মনে কোথায় যেন ওর একটা প্রবল বাধা আছে। জাত-অজাতের থেকেও প্রবল বাধা।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর সোমা বলে, বেশ। আমাদের বাড়ি আসতে আপনাকে বলব না।

কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক বেদনার আভাষ লক্ষ্য করে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অনুপম। কিন্তু কিছু বললে না।

পরদিন বিকেলে সোমা এল সোজা ওদের বাড়ি। বউদি বললে, দুপুরে এলে না? সেলাই নিয়ে?

—এই তো এসেছি। সামান্য একটা পর্দার সেলাই তো বাকী! আধঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

বউদি বললে, তাই বোস। এর মধ্যে ঠাকুরপোও এসে যাবে'খন।

হঠাৎ কেন যেন, সোমার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠল অতর্কিতে। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে সেলাইয়ের মেশিনটার দিকে মন দিল সোমা।

বউদি কী একটা কাজে বুঝি উঠে গিয়েছিল, একটুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, তোমার দাদাকে তো দেখ নি? রাতদিন বই নিয়ে থাকে। এখন বাড়ি ফিরল। আলাপ করবে?

সোমা মুখ তুলে তাকাল। তারপরে 'দাদা'র উল্লেখে কাকে বোঝাতে চায় বউদি, সেটা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আজ থাক বউদি। বরং আরেকদিন···

—ওমা, আরেকদিন কেন! বউদি বললে, দাঁড়াও এখানেই ডেকে নিয়ে আসছি।

সোমা বাধা দেবার পূর্বেই বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কেমন যেন অদ্ভুত লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল সোমার? সে কি উঠে দাঁড়াবে না মেশিনে সেলাইয়ের সুযোগ নিয়ে খাটের উপর বসেই থাকবে! বউদির ছেলেদুটিও এঘরে এখন নেই। থাকলে ওদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া যেত। এই তো ক-দিন ধরে সে আসছে-যাচ্ছে, ছেলেদুটির সঙ্গে একদিনও আলাপ হল না। নামও জানে না সে ওদের এখনও!

পরমুহূর্তেই বউদির পিছন-পিছন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন ঘরে।

দু-একদিন দূর থেকে ওঁকে সে দেখেছে, উনিও হয়ত লক্ষ্য করেছেন ওকে। অথচ অভাবিতরূপে লজ্জিত হয়ে পড়ল সোমা ওঁর সামনে! কেন কে জানে!

ওর অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ভদ্রলোক, থাক থাক উঠবেন না, কাজ করুন।

অনুপমের থেকে একটু শীর্ণ, একটু কালো, নইলে মুখের আদলে প্রচুর মিল। বললেন, 'আপনি' করে আর বলব না। তুমি আমার অধ্যাপকের ভাইঝি। তোমার বড় জ্যেঠামশাই, যিনি গিরিডিতে থাকেন, শুনেছ নিশ্চয়ই? আমি তাঁরই ছাত্র।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল সোমা, এগিয়ে এসে হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সোমা।

অপ্রস্তুত হয়ে মহেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে-আরে থাক-থাক করছ কী!

তারপরই স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, দেখছ তো! কী চমৎকার শিক্ষা!

বউদির মুখখানা ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে!

মহেশ্বরবাবু বললেন, কে বলবে বিলেতে মানুষ! চাল-চলনে একেবারে বাঙালী! বোস তুমি, বোস, ওদের সঙ্গে গল্প কর। আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে। কই গো?

বলে উচ্চৈস্বরে স্ত্রীকে ডেকে, পরক্ষণেই তাকে পাশে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, এই যে। একটু চা-টা কর!

—করছি। বউদি বললে, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বোস।

—হ্যাঁ বসি, মহেশ্বরবাবু বললেন, অনুকে পাঠিয়েছি বেহালায় আমার সেই বন্ধুর বাড়ি একখানা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজে, এলে পাঠিয়ে দিয়ো একবার।

বলে, ঘরের বাইরে পা দিয়ে সামনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়ালেন আবার, বললেন, ওই যে অনু এসে গেছে বলতে-না-বলতে। তোমার দেওরটি বাঁচবে অনেকদিন। কী বল?

তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে। বউদি বললে, হয়েছে। ভাইকে নিয়ে এখন ঘরে গিয়ে বোস। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তাই দাও! বলতে বলতে নিরুপমবাবু বললেন, আয় রে অনু, এ ঘরে। বইটা পেয়েছিস ?

অনুপম কী উত্তর দিল নিম্নকণ্ঠে, ভাল করে শুনতে পেল না সোমা।

কিন্তু, আজ না ওকে ওর পড়ানোর কথা ?

বউদি কিছুক্ষণ পরে সত্যিই চা আর প্রচুর জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। বললে, খাও।

—ভেবেছ কী তুমি ? সেলাইটা ততক্ষণে প্রায় শেষ করে এনেছে সোমা, আমি রাক্ষস না কি ?

বউদির মুখে সেই মিষ্টি হাসি। বললে, একটুকু মুখে দাও ভাই। গরীবের ঘর—

মুখে একটা ম্লান ছায়া জেগে উঠল সোমার, বললে, ও-কথা আমাকে বলছ বউদি ?

বউদি ওর হাতটা জড়িয়ে ধরল তাড়াতাড়ি, বললে, লক্ষ্মীটি, মনে কিছু কোর না। তুমি আমার ছোট্ট বোনটি!

বাকী সেলাইটুকু চট করে শেষ করে নিয়ে সহজভাবেই চায়ে মন দিল সোমা; তারপরে বললে, তোমার ছেলে-দুটিকে ডাক না ? ওরা আমার থেকে দূরে দূরে থাকে।

—না গো, ওরা অমনি। মা-ছাড়া কাউকে জানে না, কাকুর কাছে একটু যায়। বাবার কাছে তো ঘেঁষে না বললেই হয়।

—ডাক না ওদের!

—ডাকছি।

বউদি ছেলেদের ডেকে নিয়ে এলেন। বড়োটি—দশ বছরের। ছোটটি—ছ-বছরের।

—নাম কী ওদের ?

বউদি বললে, নাম বল ?

বড়োটির নাম, অর্ঘকুসুম। আর ছোটটির নাম অভ্রজ্যোতি।

বউদি হেসে বললে, শুনলে ত নাম? এইসব খটমট নাম ওদের কাকুর দেওয়া। আর, এই নামই ছেলেদের পছন্দ। এই নামই চলন হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।'

এর কিছুক্ষণ পরে, যখন ওকে টেনে নিয়ে ওর দেওরের ঘরে এলেন বউদি, অনুপম তখন দাদার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে সবেমাত্র ওর চেয়ারে এসে বসেছে।

—বাব্বাঃ! নামও রেখেছেন আপনি, ভাইপোদের! আমার মুখে উচ্চারণই হতে চায় না।

বউদি বললে, তোমরা গল্প কর, আমি তোমার অর্ঘ আর অভ্রকে ওঘরে পড়তে বসিয়ে দিয়ে আসি। আলোটা জ্বাল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

বউদি চলে গেলে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে অনুপম বললে, বসুন। আজ থেকে পড়া শুরু করা যাক, কেমন?

সোমা ওর খাটের একপ্রান্তে বসে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, আজ থাক্।

—কেন?

—এমনি। আজ বউদির কথামত গল্পই করা যাক।

—কী গল্প?

সোমা বললে, আজ দাদার সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেদের সঙ্গেও। বড় ভাল লাগছে, জানেন! ঠিক বোঝাতে পারব না, ও-দেশে বসে আনমনে এইরকম এক অনাড়ম্বর সংসারের স্বপ্নই বুঝি দেখেছিলাম!

অনুপম চেয়ারটা ওর কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে এসে বসল। বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, অপরাধ নেবেন না? আচ্ছা, আপনি কি ওবাড়িতে সুখে নেই?

উত্তর জোর করে দিতে গিয়ে পারা গেল না, কণ্ঠ হঠাৎ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল. চোখের কোণেও এসে গেল অতর্কিতে—জল। মুখ ফিরিয়ে কোনক্রমে তা গোপন করলে সোমা।

আর, তা ঠিক লক্ষ্য করলে কি না অনুপম, বোঝা গেল না, নিজের মনের আবেগেই সে বলে উঠল, কাল আপনার বাবাকে দেখলাম। একটা রাস্তার ও-ফুটপাতে গাড়ি রেখে, হেঁটে এ-ফুটপাতে আসছেন একটা স্টেশনারী দোকানে কী সব কিনতে। পরনে স্যুট, কিন্তু সত্যি বলছি, চেহারায় অদ্ভুত সৌম্যতা ? আচ্ছা, ওঁকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে সুন্দর মানায়, না ?

কোনক্রমে নিজেকে সামলে সোমা উত্তর দিল, কি জানি! কখনও তো দেখি নি!

—বললেই পারেন!

সোমা চুপ করে রইল। লোকটি তার মনের এক গোপন অভিলাষের কথা যেন টেনে বার করেছে। কিন্তু, এ ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তার বাবা যে কত নির্ভরশীল, সেকথা তার চেয়ে আর কে বেশী জানে!

কী মনে করে হঠাৎ-ই উঠে পড়ল সোমা, বলল, আজ আমি যাই, কেমন ?

অনুপমও উঠে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। সে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, সে কী! কেন ?

ওর চোখের ওপর দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য স্থাপিত করে সোমা কোমল কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, আজ যাই, কেমন ? বউদিকে বলবেন।

ওর পিছন-পিছন বাইরের দরজার কাছটায় এল অনুপম, বললে, আমার কথায় মনে কিছু করলেন না তো!

ঘুরে দাঁড়াল সোমা, বলল, পাগল!

আশ্চর্য রকমে পরিবর্তিত হয়ে গেল অনুপমের কণ্ঠস্বর, কেমন যেন অদ্ভুত আবেগে সে বলে উঠল, যদি বলি, তাই ? আমি সত্যিই পাগল!

ওর চোখে কী দেখতে চেষ্টা করল সোমা ? একটুক্ষণ থেমে থেকে শান্ত কণ্ঠে বললে, জানি।

—না জান না! চাপা কণ্ঠে অনুপম বলে উঠল, কত অন্যায়

এটা, তা জানি, জানি এ কখনও হবার নয়, জানি চরম দুঃখ এর জন্য লেখা আছে আমার ললাটে, তবু—

—তবু? সোমা তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বললে, থামলে কেন?

অনুপম কোন কথা বলতে পারল না আর! হৃদয়ের সমস্ত আবেগ এসে তার কণ্ঠকে রোধ করেছে যেন হঠাৎ!

সোমা অনেকক্ষণ ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল সেই আবছা অন্ধকারে। অনুপম যেন নিথর নিশ্চল এক পাষাণ-মূর্তি।

সোমা বললে, অন্ধকার হয়ে গেছে পথ। আমাকে একটু এগিয়েও দেবে না?

—চল।

কলকাতার সমাজে নতুন করে পরিচিত হতে কয়েকটা দিন সত্যিই সময় লাগল। প্রাথমিক পরিচয়ের পালা একরকম সাঙ্গ হবার পর, নেলী একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলেন বেশ উত্তেজিত হয়ে। ঘরে ঢুকে, কোনও ভূমিকা না করে, সোজাসুজি স্বামীকে বলে বসলেন, তোমরা করছ কী? অভিজিৎ বোস কত বড় ব্যারিস্টারের ছেলে, তা জান? সে একদিন নাকি এ বাড়িতে এসেছিল, আমি তখন কলকাতায় এসে পৌঁছই নি, তুমি বা তোমার মেয়ে তার কোন খাতির-যত্নই নাকি কর নি?

সুধীর মুখার্জি একটু আশ্চর্য হয়েই ইজিচেয়ারে উঠে বসলেন সোজা হয়ে। প্রশ্ন করলেন, কে অভিজিৎ বোস?

—ডোণ্ট্ টক্ রট্! নেলী বললেন, আমার থেকে তোমারই বেশী জানবার কথা। লণ্ডনের সাম্ মিস্টার সিদ্ধান্তর চিঠি হাতে মেয়ে ত্রিভলী পার্কে বীরেশ্বর বোস বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিল না? সুমনাকে সঙ্গে নিয়ে? সেই বীরেশ্বরবাবুর ছেলের নামই অভিজিৎ। আমি বাই-চান্স্ কথাটা শুনলাম। আলাপও হল ছেলেটির সঙ্গে। ওয়াণ্ডারফুল ছেলে। যেমন সুন্দর দেখতে,

তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি স্মার্ট! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। নিজেও খুব প্রেমিসিং ব্যারিষ্টার।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর বোধহয় চিনতে পারলেন মুখার্জি। সেই যে ছেলেটি এসেছিল একবার। ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সেদিন, বেশীক্ষণ কথা বলতে পারেন নি। সোমা তাকে চা-টা খাইয়েছিল বোধহয়।

নেলী বললেন, আমি তাকে আসতে বলেছি।

—বেশ তো!

একটুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। নীলিমা বললেন, ভাল কথা, জান? গতকাল সুমনা বিয়ে করেছে? এক সিনেমা-অভিনেতাকে?

—জানি।

—জান!

—হ্যাঁ। চিঠিটা বোধহয় আমার বইয়ের টেবিলে আছে, ঘরে। চিঠি লিখেছে আমাকে। লিখেছে, রেজেষ্ট্রী বিয়ে। আজ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি না তোমাদের, মাত্র আশীর্বাদটুকু চাইছি।

নীলিমা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ নিরুত্তরে।

তারপরে বললেন, কবে এসেছে চিঠিটা?

—কাল।

ক্ষুব্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে নীলিমা বললেন, আর আমাকে তা জানাও নি?

—ভুলে গেছি।

—চমৎকার তোমার ভুল! নীলিমা বললেন, ভাগ্যিস্ আজ অভিজিৎদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তোমার মেজদার বাড়ি গিয়েছিলাম! নইলে, কিছুই জানতে পারতাম না।

মুখার্জি সাগ্রহে বলে উঠলেন, দেখা হল সুমনার সঙ্গে? কেমন জামাই হয়েছে?

নেলী বললেন, সুমনা কোথায় যে দেখা হবে? সে তো তার স্বামীর বাড়িতে। ওবাড়ির নাকি খুব কাছেই। যেতে চাইলাম,

কিন্তু তোমার মেজদাই বাধা দিলেন। বললেন, ও-মেয়ের মুখদর্শন কোর না বউমা। মেজদি লুকিয়ে কাঁদলেন আমার কাছে। শেষ-কালে বিয়ে করল কি না সিনেমার অভিনেতাকে? তোমার মেজদা তো ভীষণ রেগে গেছেন! কিন্তু, এতে রাগবার কী যে আছে, তা তো জানি না! শুনলাম, রীতিমত টাকাওয়ালা ছেলে! সুমনা তো সুখে থাকবে! কিন্তু, একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?

—কী?

নেলী বললেন, তোমার মেয়ের সঙ্গে তো দেখেছি ওর খুব ভাব, তাকেও একবার নিমন্ত্রণ করল না সুমনা?

মুখার্জি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, সোমাকেও চিঠি দিয়েছে সুমনা। কী লিখেছে জানি না। খামের চিঠি। বেশ বড়ো চিঠি বলেই মনে হল।

আরেকবার বিস্মিত হবার পালা নীলিমার। একটুক্ষণ নির্বাক থেকে, তারপরে বললেন, চিঠি থেকে বাদ গেলাম শুধু আমিই! তা বেশ, অনেক-কিছু থেকেই তো বাদ পড়ে আছি, এর থেকেও যে যাব, তার আর আশ্চর্য কী!

মুখার্জি মুখ নীচু করে নীরবে হাতের বইটায় আবার মনঃসংযোগ করলেন।

নেলী কী যেন ভাবছিলেন চুপ করে। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, তোমার মেয়েকে একটু ডাকবে? চিঠিটা একটু দেখতাম।

মুখ তুললেন মুখার্জি, বললেন, তুমিই ডাক না?

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন নেলী, না।

ম্লান একটা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মুখার্জির। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। একটুক্ষণ পরেই তিনি আয়াকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠালেন সোমাকে।

দ্বিধাবিজড়িত পায়ে ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল সোমা, বলল, আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

মুখার্জি ওর দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন, তোমাকে সুমনা চিঠি লিখেছে না ?

—হ্যাঁ।

—চিঠিটা নিয়ে এস তো ? তোমার মা একটু দেখতে চান। আপত্তি নেই তো ?

—না বাবা, আপত্তি কেন থাকবে ? সোমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এখুনি নিয়ে আসছি।

বলেই দ্রুতপায়ে চলে গেল সোমা। আর আশ্চর্য, মুখ ফিরিয়ে ওরই প্রস্থান-পথের দিকে তাকিয়ে আছেন নীলিমা, চোখের দৃষ্টি কোমল, স্নেহস্নিগ্ধ !

একটু অবাকই হলেন মুখার্জি, একটু খুশীও হলেন মনে-মনে।

কয়েকমুহূর্ত পরেই চিঠি নিয়ে এল সোমা, বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন।

—তোমার মাকে দাও।

মায়ের দিকে ত্ব-এক পা এগুতেই নীলিমা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ওকে পাশের চেয়ারটি নির্দেশ করে বলে উঠলেন, বস তুমি।

বোধহয় একটু বিস্মিতই হল সোমা, হয়ত বা মনে-মনে শঙ্কিতও। প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আমি !

—হ্যাঁ। বস।

যন্ত্রচালিতের মত ধপ করে করে বসে পড়ল সোমা।

মুখার্জি বই-এর আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করছিলেন। নীলিমা চিঠির খামটা উলটে-পালটে দেখে সেটা সামনের টিপয়ে রেখে দিলেন, খুললেন না চিঠিটা। সোমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখেছে সুমনা ?

সোমার কাছে সমস্তই যেন অভাবিত মনে হচ্ছিল, সে কী বলবে না বলবে ঠিক করতে না পেরে বলে উঠল, পড়বেন না ?

—না। নেলী বললেন, তোমার চিঠি আমি পড়ব কেন ? কী

লিখেছে সেটা তুমিই বল। সুখী হয়েছে তো? এখানে আসবে কবে জামাইকে নিয়ে?

সোমা একটু ইতস্তত করে তারপর বললে, চঞ্চলবাবুকে আমি দেখেছিলাম। ভাল লোক। সুমনার সুখী হবারই তো কথা।

—দেখেছিলে? নীলিমা সাগ্রহে বলে উঠলেন, কবে? কোথায়? এ বাড়িতে তাকে সঙ্গে করে কবে এসেছিল সুমনা?

—এ বাড়িতে আসে নি, সোমা তার অভ্যস্ত ধীর কণ্ঠে বললে, আমাকে সুমনাই একদিন ধরে নিয়ে গিয়েছিল চঞ্চলবাবুর বাড়িতে, আলাপ করিয়ে দিতে।

—রিয়্যালি! নেলী বললেন, কেমন দেখলে? খুব স্মার্ট?

—হ্যাঁ।

—ঝক্‌ঝকে চেহারা?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

—বাঙলা ছবির ও 'মোস্ট অ্যাডমায়ার্ড হিরো', নেলী প্রবল উৎসাহে বলতে শুরু করলেন, বাড়িটা কেমন দেখতে? খুব সুন্দর?

—হ্যাঁ।

—আমিও তো দেখেছিলাম বাইরে থেকে। সামনে ছোট্ট একটু লন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—নাইস্। ভালই বিয়ে হয়েছে সুমনার। মেজভাসুর যে কেন অত রেগে গেলেন, তা তো বুঝি না! আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার চিঠি তুমি উঠিয়ে নাও।

চিঠিটা হাতে নিল সোমা, তারপরে একটু ইতস্তত করে বললে, যাব?

—অ্যাঁ! কী যেন ভাবছিলেন নীলিমা, ওর প্রশ্নে একটু চমকেই উঠলেন, তারপরে বললেন, যাও।

উঠে দাঁড়াল সোমা। বাবার মুখ দেখা যায় না, হাতের

বইয়ের আড়ালে ঢেকে গেছে। এক মুহূর্ত সেই দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুতপায়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেল সে।

আবার বেশ কিছুক্ষণের জন্য অখণ্ড নীরবতা দু জনের মধ্যে। নীলিমা বললেন, আমিও চিঠি পেয়েছি। আমার মায়ের।

—কী লিখেছেন!

—ভালই আছেন। সোমার কথা লিখেছেন। ওর সম্বন্ধে কিছু উপদেশও দিয়েছেন।

—কী?

—আমিও কদিন ধরে সে কথা ভাবছিলাম, নেলী বললেন, এভাবে ওকে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

বইটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মুখার্জি, বললেন, মানে?

নীলিমা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, অবশ্য তোমাকে বলা দরকার। আমি ঠিক করেছি সোমাকে নিয়ে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাব।

একটু যেন আশ্বস্ত হলেন মুখার্জি, খুশীর সুরেই বলে উঠলেন, বেশ ত! মা তুমি। বেরোনই তো উচিত।

ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে নেলী বললেন, কিন্তু মেয়ে কি শুনবে আমার কথা! দেখলে না, আমার কাছে একটুক্ষণ বসতে না-বসতেই তার হাঁপ ধরে গেল।

কোমল স্বরে মুখার্জি বললেন, কাছে ডাক। তুমি নিজে কাছে ডাকলে সে পালাবে কেন?

—এই তো ডাকলাম, গেল কেন?

একটু হেসে মুখার্জি বললেন, তুমি তো ডাক নি, ডেকেছিলাম আমি। এবার তুমি ডাক, দেখবে যতক্ষণ কাছে বসিয়ে রাখতে চাও ততক্ষণ বসে থাকবে।

—বেশ। তোমার সামনেই আমি ডাকছি। সোমা—সোমা?

তাঁর উচ্চকণ্ঠ ঠিকই পৌঁছাল সোমার ঘর পর্যন্ত। সে চকিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। তারপরে তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বাইরে এল সে। মা ডাকছেন? মা?

আবার এলো সে ঘরে। একটু আশ্চর্য হয়েই নীলিমাকে বললে, ডাকছিলেন ?

নেলী বললেন, হ্যাঁ, বস তুমি।

সেই চেয়ারটাতেই আবার বসল সোমা। এবার চিঠির প্রসঙ্গ নয়, হয়ত বা অন্য কিছু। কি-এক অজানা আশঙ্কায় হঠাৎ আবার কেঁপে উঠল ওর বুক। বৌদিদিদের বাড়ি যাওয়া নিয়ে কোনও কথা নয় তো ? মা-বাবার জানবার কথা নয়। তাঁরা যাতে না জানতে পারেন, সে বিষয়ে তার সাবধানতার অন্ত নেই। এক যদি আয়া কি বেয়ারা কিছু বলে দিয়ে থাকে। কিন্তু ওরা তো সে রকম নয়। ওরা ওকে খুবই স্নেহ করে, ভালবাসে। তবে ? বাবাকে তত ভয় হয় না, মনে হয়, বাবা সব শুনলে মানাই করবেন না। কিন্তু, মা ? মাকেই যে তার সব থেকে ভয়!

এইসব ভাবতে-ভাবতে মুখখানা ওঠানো মাত্রই বাবার চোখে চোখ পড়ে গেল সোমার। কী স্নেহঝরা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতেই না চেয়ে আছেন তার দিকে। যেন বলতে চান, ভয় কী মা ? আমি আছি।

হঠাৎ মনে হলো বহুদিন পরে, আজ দু দুবার বাবার ঘরে এল সে। বাবাকে সে কাছে পায় না। প্রায়ই তিনি বাইরে, নিজের হাজারো কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কী কাজ ? মেজো জ্যেঠামশাইয়ের মত চাকরী থেকে অবসর নেবার পরও অন্য চাকরী নেবার চেষ্টা করছেন নাকি বাবা ?

কে জানে! জিজ্ঞাসা করার অবকাশও পাওয়া যায় না। খাওয়ার টেবিলে রোজ দুবেলা দেখা হয়, কিন্তু মা থাকেন কাছে, কোনও কথা বলতে ভয় হয়। অন্য সময়ও তো বাবার কাছে সর্বক্ষণ থাকেন মা। কখন তাঁর কাছে গিয়ে সে কথা বলবে ? বাবাও ডাকেন না তাকে। কিন্তু চলতে-ফিরতে সামনা-সামনি পড়ে গেলে এমন করে চোখ তুলে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান, যেন মুহূর্তে সমস্ত বেদনা নিঃশেষে মুছে যায়। আজও তেমনি করে চেয়ে আছেন তার দিকে। সেদিক থেকে চোখ ফেরানো শক্ত, তবু ফেরাতে হবে।

মা যদি কিছু মনে করেন! যদি আবার কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয়!

সেখানেই তো ভয়ানক ভয়।

অশান্তির আগুনে জ্বলছেন তার বাবা, এ সে সহ্য করতে পারে না। এর জন্য যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত। নেলী কী যেন বলবার চেষ্টা করছিলেন সেই থেকে। এক একবার মুখ তুলছিলেন, আবার নামাচ্ছিলেন। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে এক সময় বলে উঠলেন, তুমি তো আমাকে মনে-মনে ভয়ানক একটা জীব মনে কর, কিন্তু ভালবাসতে আমিও জানি।

মুখ তুলল সোমা। তার চোখের ওপর চোখের দৃষ্টি রেখে নীলিমা বললেন, জান, আমার নিজের পেটেও একটা মেয়ে হয়েছিল। সে নেই।

বলতে-বলতে, কী আশ্চর্য, হঠাৎ আঁচলে মুখ ঢেকে একেবারে কেঁদে ফেললেন নীলিমা।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন মুখার্জি। অভাবিত এ দৃশ্য। এ ছবি যে কোনও দিন তিনি দেখবেন, তা বোধহয় কখনও কল্পনাও করেন নি!

সোমার মনটাকেও যেন মুহূর্তে জয় করে নিয়েছেন নীলিমা। সোমার মনে হল, চীৎকার করে সে বলে ওঠে, মা!

কিন্তু, বলতে পারল না, কণ্ঠস্বর ফুটল না, পাথরের মত এক ভাবেই বসে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুললেন নেলী, আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, কী ভাবে থাক তুমি বল তো! একেবারে সন্ন্যাসিনীর বেশ।

বলেই, মুখার্জির দিকে মুখ ফিরিয়ে, তুমিও তো কিছু বলতে পারো।

এ কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, মুখার্জি বললেন, যা বলবার তুমিই বল। ও তোমার সব কথা শুনবে।

সোমার দিকে ফিরলেন নেলী, বললেন, শুনবে তো?

দুটি ছলোছল চোখ তুলে সোমা বললে, শুনব মা।

নেলী বললেন, মা বলে ডাকলে, মনে থাকে যেন! কাল থেকে রীতিমত টয়লেট করবে। আর বেরবে আমার সঙ্গে। ক্লাবে যাবে।

ক্লাব!

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরে নিজের ঘরে এসেও মন থেকে মুছে যাচ্ছে না প্রশ্ন, কীসের ক্লাব? সেই যে লণ্ডনে মেলামেশার জন্য বহু ক্লাব আছে, সেই রকম ক্লাব? তাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাব ছিল। নাচের আসর বসত। এ ওর হাত ধরাধরি করে দুজনে-দুজনে নাচছে, সেই রকম ক্লাব?

কিন্তু সে, সব তো ভালো লাগবে না সোমার।

ভালো লাগত না বলেই তো ভারতবর্ষে আসা।

ভেবে কিছু কূল-কিনারা না দেখতে পেয়ে তার জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালো সোমা। পর্দা সরালো। ঘরের মানুষটিকে আবছা দেখা যায়। টেবিলের জোরালো আলোর দ্যুতি এসে ছিটকে পড়েছে বাইরে। নিজের চারিদিকে যেন এক জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে তার মধ্যে নিজের আসনে বসে একমনে কাজ করে চলেছে তপস্বী, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

চট্ করে জানলা থেকে সরে এল সোমা। বাবার মুখখানাই ভেসে উঠল চোখের সামনে। মুখে হাসি, কিন্তু তবু যেন এক চির-বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে আছে সেখানে, যা কখনও বুঝি ঘুচে যাবার নয়!

না, বাবার জীবনে নতুন করে অশান্তির ঝড় আর সে উঠতে দেবে না। কখনই না। কিছুতেই না।

সুমনার চিঠিটা আবার পড়বার জন্য তখন টেবিলের ওপর খুলে রেখে দিয়েছিল। ওটা ভাঁজ করে খামে পুরে যত্ন করে রেখে দিল সে ড্রয়ারে। রেখে দিয়ে, আবার টেনে নিল। নিয়ে খুলল আরেকবার। বড় মূল্যবান চিঠি লিখেছে সুমনা। তার মধ্যে একটা কথা আরও অমূল্য, 'এই জীবনে এটুকু জেনেছি দিদি, যে

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ পোষাকে-আসাকে চিন্তায়-ভাবনায় আচারে-ব্যবহারে একই ধরণের মানুষ গড়ে উঠছে। যেন সর্বগ্রাসী একটা অগ্নিশিখা সবাইকে পুড়িয়ে ঠিক এক ছাঁচে ঢালাই করতে চায় আজ। আর সে ছাঁচ হচ্ছে জড়বাদের ছাঁচ। বহিরঙ্গের বিচ্যুতি। এক অদ্ভুত অন্তরহীনতা! অন্তর নেই, শুধু দেহ, আর দেহবাদ। এর মধ্যে কোথায় খুঁজবে তুমি তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষকে? সে নেই। তার বৈশিষ্ট্যও নেই। যার জীবনে এসেছি, সে আমাকে নিয়ে প্রথম-প্রথম খুবই মত্ত হবে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরে আসবে তার ক্লান্তি। তখন পাব অবসর। ওর এই বিশাল বাড়িটা নীরবতায় দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমি এক কোণে বসে প্রচুর বই পড়ব। এত পড়া নয়, নিজের বিশিষ্ট স্বত্তাটিকে সযত্নে রক্ষা করা।'

চিঠিটা খামে পুরে ড্রয়ারে রেখে দিতে দিতে সোমা নিজের মনে মনেই বললে, আমিও কি পারব না আমার বিশিষ্ট স্বত্তাটিকে রক্ষা করতে? মা আমাকে নিয়ে যেখানেই যান না কেন, যাদের সঙ্গেই মিশতে দিন না কেন, আমি টলব কেন? আমি অন্যরকম কিছু হব কেন?

তাই, নীলিমার প্রস্তাবের একটুও প্রতিবাদ করলো না সোমা। বরং তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে সে যেন নেলীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করল।

তার লম্বা ঘন চুল কেটে ফেলবার প্রস্তাবেও সে অবশেষে রাজী হয়েছিল। কিন্তু কী ভেবে নেলীই আর কাটালেন না। তবে, হেয়ার-ড্রেসারের কাছে নিয়ে গিয়ে কারুকার্য করিয়ে আনলেন।

তারপর করা হল উপযুক্ত টয়লেট আর বেশবাশ। রুজ আর লিপষ্টিকের প্রলেপ, আর চিবুকের কাছে কালো তিলের মতো বিউটি স্পটও হল আঁকা।

নেলী তার মুখখানা ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, তারপরে হেসে বললেন, কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি।

ছয়

কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে মনোরম বিকেলবেলাটা, সূর্যও কখন ডুবে গেছে পশ্চিম দিগন্তে, তার সেই ক্যানেলের ধারে গিয়ে বেড়ানো আজ আর হল না। বোধহয় আর কোনদিনই হবে না। প্রসাধন-পর্বে এত সময় লাগে? মা কিন্তু জানেনও প্রচুর। বাবাকে গিয়ে যখন সে প্রণাম করল, বাবা কেমন-যেন অদ্ভুত বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেন নি। সোমাও দাঁড়িয়েছিল মুখ নীচু করে। তারও ভীষণ লজ্জা করছিল।

মা বলেছিলেন বাবাকে, Isn't she a beauty?

বাবা ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, Yes, she is.

সোমা আর দাঁড়ায় নি, একপ্রকার ছুটেই সে চলে এসেছিল নিজের ঘরে।

হঠাৎ তার সমস্ত দেহ-মন একটা অদ্ভুত খুশীর আবেগে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে। উজ্জ্বল গোলাপী রঙের জর্জেট শাড়ি তাকে পরিয়ে দিয়েছেন মা, টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ। নিজের ঘরের আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখতে দেখতে মনে হল, মায়ের প্রসাধন-নৈপুণ্যের তুলনা হয় না! বহুক্ষণ ধরে বহু যত্ন করে নিজের হাতে তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন মা। তার সারা গায়ে মায়ের স্পর্শ। মা তাকে এতদিনে সত্যিই ভালবেসেছেন, না হলে এমনটি হতে পারত না।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে হল। এই বেশে এখন ওদের বাড়ি গেলে কেমন হয়? কী বলবে তাকে এভাবে দেখলে

অনুপম? খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল সে নামটা, 'অ-নু-প-ম!' নিজের অস্ফুট কণ্ঠস্বর নিজেরই কাছে শুনাল অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু ওর কাছে যাওয়াতো এখন সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল সোমা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তার ঘরের মত ওর ঘরেও জ্বলছে আলো। ওই তো সে, তার জানলার ধারে, টেবিলের সামনে বসে কী একটা বইয়ের দিকে ঝুঁকে। তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিল সোমা। জানলার শিক ঘেঁসে দাঁড়াল। একবারও কি ও দেখবে না মুখ তুলে? একটি বারের জন্যও? 'অ-নু-প-ম!'

এক-একটি মুহূর্ত নয় তো, এক-একটি দণ্ড কেটে যাচ্ছে যেন। ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, বইয়ের একটা পাতা উলটে গেল একসময়। তারপরে, হঠাৎ কী মনে করে মুখটা তুলতেই—

কিন্তু সোমাকে কি ও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছে তার সুসজ্জিত কেশকলাপ, তার গোলাপী শাড়ি, তার মায়ের দেওয়া ঝলমল-করা মুক্তো-বসানো গলার হারটা?

সোমার পিছনে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বলছে। অতএব তার সাজসজ্জা ভাল করে দেখা সম্ভব নয় ওর পক্ষে, হয়ত তার ছায়ামূর্তিটুকুই দেখছে সে। যাকে দেখতে হবে, পিছন থেকে তার আলো পড়লে ছায়া-ছায়াই দেখায় সামনে থেকে। আলোটা নিবিয়ে দেবে সোমা? তাহলে তো সব অন্ধকার। এটুকু দেখাও দেখতে পাবে না ও।

কী অদ্ভুত মানুষের মন! হঠাৎ-ই দুটি চোখ ছলছল করে এল সোমার। মনে হল, এই-ই ভাল। ও আমার প্রসাধন ভাল দেখতে না পেয়ে যে ছায়ামূর্তি দেখছে, সে-ই ভাল। এ বেশ তো ওর দেখবার নয়। এ বেশ তো ওকে দেখাবারও নয়।

চট করে জানলা থেকে সরে গেল সোমা। কিন্তু ওর সম্বন্ধে একথাই বা মনে হল কেন? তার বাবা তার এ বেশ দেখে যখন খুশী হলেন, ও-ও নিশ্চয় খুশী হত। হত কী? হত

না। সোমার মন বার বার গুঞ্জন তুলতে লাগল, 'হত না, হত না!' আর সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য, তুটি চোখ ভরে উঠল জলে।

—সোমা?

ভেসে এল মায়ের ডাক। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সাড়া দিল সোমা। সুইচ টিপে ঘরটা অন্ধকার করে দিল। আর তারপর?

যেন স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে যেতে লাগল সে। ক্লাবে এক-একদিন বল-নাচেরও আসর বসে। কে যে কখন তার হাত ধরে তাকে নাচের মধ্যে টেনে নেয় কে জানে! সুন্দর সেই পরিচ্ছন্ন রুচির ছেলেটির মনোযোগই যেন বেশী। তার নাম, অভিজিৎ।

এও এক আশ্চর্য জগৎ! এ জগতের চতুঃসীমার মধ্যে দিনের পর দিন কেটে যায় তার। যেন এক নেশার ঘোরে কাটে। গভীর রাত্রে মায়ের সঙ্গে ফিরে আসে, ঘুম থেকে সকালে উঠতে-উঠতে দেরী হয়ে যায়। তার ঘরেই আজকাল 'ব্রেকফাষ্ট' নিয়ে আসে আয়া। নীচে গিয়ে বসতে হয় না চায়ের টেবিলে বাবার মুখোমুখি। তুপুরে খাবার টেবিলে বাবার সামনে মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে সে খেয়ে আসে, ততটা লজ্জা করে না। লজ্জার জড়িমা বোধ করে সে সকালে, ঘুম থেকে উঠে। মনে হয়, ক্লাবের সমস্ত আবহাওয়াটাকে সর্বাঙ্গে বহন করে সে যেন তার বাবার সান্নিধ্যকে মলিন করে তুলছে। তার চেয়ে এই ভালো, সারাটি সকাল নিজের ঘরে অসীম আলস্য নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া।

জানলার কাছে গিয়ে অভ্যাস মত দাঁড়াত প্রথম-প্রথম। কিন্তু সূর্য উঠে গেছে বহুক্ষণ, জবার মতো রক্তিম আর তুাতিমান, কাকে প্রণাম জানাবে সে।

নীচের দিকে অভ্যাস মতই তাকাতো। কিন্তু, কোথায় সে? টেবিলের সামনে তো সে বসে নেই! 'অ-নু-প-ম!'—অতি কষ্টে, অতি ক্লিষ্ট কণ্ঠে যেন তার নামটা উচ্চারণ করল সোমা।

ভালোই হয়েছে, তাকে সে দেখে না। কিন্তু যদি কোনও দিন

দেখে ফেলে? যদি হঠাৎ জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে চোখ মিলে যায় তার। সে কি আর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাবে সোমার দিকে? তাকাতে পারবে?

ভাবতে গিয়ে বড় ভয় করে সোমার। তার চেয়ে এই ভালো, এই ঘুম-ভাঙার পরও বিছানায় শুয়ে থাকা। ভোর হওয়া সত্ত্বেও জানলার কাছে গিয়ে না দাঁড়ানো।

ক্লাবের জীবন কোনও কোনও দিন ভালোও লেগে যায়। ভীষণ ভালো। লণ্ডনের সেই স্কুল আর কলেজ-জীবনটাকে যেন ফিরে পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। সেই অচেনা কোনও ছেলের গায়ে গা ঠেকিয়ে মৃদু লয়ে পা ফেলে ফেলে নাচ। সেই ফিলিপ আর টম আর উইলির মতই কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ওরা গানের সুরের মত কথা বলে। কত ছেলে! সবারই মধ্যে সূক্ষ্ম এক প্রতিযোগিতা, কে তার সঙ্গে কতক্ষণ নাচতে পারে।

তার মায়ের চারপাশেও ছেলেদের ভীড়। কেউ বলে মাসিমা কেউ বলে, ডিয়ার আন্টি। ইয়োরোপীয়ান সমাজেরও দু চারজন নিয়মিত আসেন। তবে অধিকাংশই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের। চাঁদা দিয়ে গড়ে তোলা এ এক প্রাইভেট ক্লাব। মাসে মাসে মোটা টাকাই চাঁদা দিতে হয় বুঝি প্রত্যেককে।

বড় একটা পিয়ানো আছে একধারে। কেউ-না কেউ-না গিয়ে সেটা বাজাচ্ছেই। কেউ বলে, একটা গান করুন না মিস মুখার্জি। একটা রিয়্যাল স্কচ গান।

সে একটু হেসে সরে আসে, বলে, জানি না।

হঠাৎ একদিন অভিজিৎ গিয়ে পিয়ানোয় বসে। মন্দ বাজায় না। একদিন 'Last Rose of Summer' বাজালো চমৎকার। কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে এ যেন অন্য এক দেশের পরিবেশ। এ অঞ্চলকে এ সহরের বিলাস-কেন্দ্র বলা চলে। কোথাও চকিতের জন্য মনে হয়, লণ্ডনের কেনসিংটনে এসেছি। কোথাও আসে ষ্ট্রাণ্ডের

সঙ্গে মিল। আরও একটু হেঁটে ভিতরের দিকে গেলে, ল্যাম্বেথের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। সেই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রীজ পেরিয়ে লণ্ডনের দরিদ্র-পল্লী-ল্যাম্বেথ। তার মা আছে এই ল্যাম্বেথেই একটা ছোটদের ছোট্ট স্কুল তৈরী করে।

কোনও কোনও দিন মায়ের নির্দেশে সে বেরিয়ে পড়ে অভিজিতের মোটরে। চৌরঙ্গি পেরিয়ে একেবারে ময়দানের অভ্যন্তরে। গাড়ী রেখে, কখনও বা তারা হেঁটেও চলে পাশাপাশি। হাঁটতে-হাঁটতে এক-একদিন গ্লাসগোর কথা মনে হয়। মনে হয় যেন গ্লাসগোর সেই জর্জ স্কোয়ারের সামনে দিয়ে তারা হাঁটছে। সেই লম্বা গম্বুজ ওঠা জর্জ স্কোয়ারের চার্চ, সামনে পার্ক আর পায়ে-চলা-পথ, তার সামনে ছোট্ট একটু ঘাসে-ঘেরা জায়গার ওপরে এক অশ্বারোহীর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, ক্লান্ত-শ্রান্ত-মন্তরগতি এক অশ্বারোহী।

মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে মন। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ কোন্ ভারতবর্ষকে দেখতে এসেছে সে ?

অদ্ভুত এক মানসিক যন্ত্রণা। একদিন ল্যাম্বেথের কিণ্ডার-গার্টেনের ঠিকানায় মাকে সে চিঠিও লেখে সব কথা জানিয়ে। অনুপমের কথাও একটু লেখে। লেখে, জোর করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি। না ফিরিয়ে থেকে উপায়ও নেই। বাবার দিকেও মুখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে। বাবা নিজে থেকে ডেকে কিছু বলেনও না। বড় চুপচাপ হয়ে গেছেন তিনি। এখানকার মা কিন্তু খুব খুশী। তাঁকে খুশী রেখে বাবার জীবনটাকে যে শান্তিময় আর স্বস্তিময় করে তুলতে পারছি, এতেই আমার সুখ। কিন্তু তবু কেন ভিতরটা আমার মাঝে মাঝে এমন করে গুমরে মরে ? মনে হয়, আর বুঝি পারব না, ভেঙে পড়ব। তাই বলছি, এবার আমি কী করব মা, তুমি বলে দাও।

কিন্তু দিনের পর আরও দিন যায়, মার চিঠি আসে না। এ-ঠিকানায় চিঠি কি মা দেবে না ? পাছে এখানকার মা কিম্বা বাবার হাতে পড়ে ?

আবারও চিঠি লেখে সোমা। আর প্রতীক্ষা করে। কিন্তু কোনও উত্তর আসে না।

এতদিন এসেছি, একখানা চিঠিও কি আমাকে তুমি দেবে না মা!—রাত্রের অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক-একদিন ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে সোমা।

ইতিমধ্যে গৌতম এসে পড়ে কলকাতায় তার পরীক্ষা-পর্ব শেষ করে দিয়ে। প্রথম দু তিনদিন আড়ালে আড়ালে থাকবার পর অবশেষে ভাব করল সে এসে, নিজেই। বললে, তোমাকে দেখে ভাল লাগে নি। ভাবতাম, কে উড়ে এসে জুড়ে বসল। এখন দেখছি, লোকটি তুমি ভালই।

একটু হেসে সোমা বলল, কী রকম?

বয়স আন্দাজে একটু বেশী গম্ভীর দেখায় গৌতমকে। সে বলে, ভেবে দেখলাম, তোমাকে 'দিদি' বলা যেতে পারে। দিদি হিসাবে ভালও বাসা যেতে পারে।

ওর কথার ধরনে কৌতুক অনুভব করে সোমা। বলে, কী রকম ভাল বাসবে?

এতক্ষণে হেসে ফেলল গৌতম, বললে, যাঃ! লজ্জা দিও না অমন প্রশ্ন করে। তুমি অনেক—অনেক গল্প বল না দিদি। তুমি তো স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে, গল্প বল না স্কটল্যাণ্ডের। আমাদের ইতিহাসের বইতে 'ইয়ং প্রিটেণ্ডার'-এর কথা আছে, যাকে স্কচেরা মনে করে তাদের প্রিয় রাজা, যাকে তারা বলে, 'বনি প্রিন্স্ চার্লি', তার গল্প বল না।

কেমন যেন বিরস দেখায় সোমার মুখ, বলে, স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে হয়ে স্কচ্‌দের অনেক কথাই আমি জানি না।

—কেন!

সোমা বলে, ছোট থেকেই মা শিখিয়েছে, তুমি ভারতের মেয়ে, তুমি বাঙালি। নিজেকে সেই ভাবেই তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

—ভেরি ব্যাড্! গৌতম বললে, বাঙালি হতে আবার চায়

না কি কেউ ? বলে আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যায় গৌতম তার ঘরে।

তারপরে একদিন হঠাৎ মা এলেন তার ঘরে, সকালে। বললেন কেমন আছ ? কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল ফিরতে, না ?

সোমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। মা বলেন, থাক-থাক, উঠো না, বস। দেখ, অনেক সময় সোজাসুজি কথা বলা ভাল। আচ্ছা, কাল অভিজিৎ কি তোমাকে প্রপোজ করেছে ?

প্রপোজ ! যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠল সোমা। কই, না তো।

ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে আনলেন মা, বললেন, না করলেও শীগ্‌গির করবে। বড় ভাল ছেলে। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। আচ্ছা, তুমি বস, আমি যাই, কাজ আছে।

যেমন ঝড়ের মত এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন ঝড়ের মত। কিন্তু এসে এ কী শুনিয়ে গেলেন তিনি ? না—না, এ অসম্ভব। আর তাছাড়া, অভিজিৎ···সে তো তেমন···সে তো তার বন্ধু···সে তো—! কী জানি, তার মনে যে এসব আছে, তা তো মনে হয় না। সম্ভবত, অযথাই এসব ভাবছেন মা।

আবার ক্লাব। মাঝে মাঝে মেম্বারদের বাড়িতে পার্টিও হয়। পার্টি মন্দ লাগে না, কিন্তু ক্লাবের কথায় মাঝে মাঝে অন্য একটা চিন্তা এসে মনকে অধিকার করে। লণ্ডনেও এসব ধরনের ক্লাব আছে, কিন্তু সবাই যে ক্লাব-ভক্ত, এমন নয়। এদেশের সবার যেমন ক্লাব-জীবন নেই, ওদেশেও তাই। বহুলোক আছেন, হৈ-হুল্লোড় যাঁরা ভাল বাসেন না একেবারেই। কিন্তু এঁরা এদেশের অভিজাত গোষ্ঠী হয়েও এই কৃত্রিম ক্লাব-জীবনকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছেন কেন ?

সেদিন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। এক চক্কর নাচ হয়ে গেছে, এধারে-ওধারে বসে একটু বিশ্রাম করছে সবাই, অভিজিৎ উঠে

এসে তার হাত ধরে পিয়ানোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, কেন তোমার এতো উদাস ভাব, আমি তা জানি।

—কেন বল তো ?

—স্কট্‌ল্যাণ্ডের মেয়ে, স্কট্‌ল্যাণ্ডকে ভুলতে পারছ না বলে।

তারপরেই মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠল অভিজিৎ—

"From scenes like these old Scotia's grandeur springs,
That makes her loved at home, revered abroad.
Princes and lords are but the breath of kings,
An honest man's the noblest work of God !'

উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে সোমা বলে উঠল, রবার্ট বার্ন্‌স্, না ?

অভিজিৎ ওর হাত হাতে নিয়ে মৃদু একটু চাপ দিয়ে বললে, It is Burns. না-না, It burns.

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সোমা। বার্নস্ তাকে ততক্ষণে এক অপূর্ব অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে গেছে। 'An honest man's the noblest work of God !'

—কী হল সোমা, কথা বলছ না যে ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোমা বললে, না, কিছু না।

পরক্ষণেই সরে গেল সে ওর কাছ থেকে।

সেই রাত্রেই ঘর অন্ধকার করে তার জানলাটির কাছে এসে দাঁড়াল সোমা। তাকালো নীচেকার সেই জানলাটির দিকে। সেটিও অন্ধকার। কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে আমার মত ? নিজের মনেই বলে উঠল সোমা, তুমি কি noblest work of God.

পরের দিন সকাল বেলা। গৌতম এসে বললে, অভিজৎদা এসেছে দিদি। নীচে। ডাকছে তোমাকে।

—কেন ?

—কী জানি কেন! মা বললে তোমাকে ডেকে দিতে।

—আর বাবা ?

—বাবা? বাবা তার ঘরে।

—ও, আচ্ছা, যাচ্ছি।

যাই ঘটে থাকুক তার অন্তরের রাজ্যে, বাড়িতে আজকাল কিন্তু একটা স্বস্তির আবহাওয়াই বইছে। বাবার সঙ্গে তার দেখা হয় না বললেই চলে, কথাও হয় না। বাবার কণ্ঠস্বরও যেন ভালো করে, শুনতে পায় না সোমা। কত রাত হয়ে যায় ফিরতে! দেখে, বাবার ঘর অন্ধকার, বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সকালে দেখা হয় না। দেখা হয় সাধারণত মধ্যাহ্নে। কিন্তু, সে-ও মাত্র কতটুকু মুহূর্তের জন্য?

অন্তর কাঁদে। কিন্তু তবু ভালো। সেইরকম কলহ আর তো হয় না বাবা-মায়ের মধ্যে! দুজনেরই ব্লাডপ্রেসার। বাবার হাই মায়ের লো, তুমুল কলহের পরিনামে যে-কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই শান্তি চায় সোমা। তার বিনিময়েই শান্তি আসুক, স্বস্তি বিরাজ করুক বাড়িতে।

জানলায় গিয়ে দাঁড়ালে একবারের জন্যও কি তোমায় দেখতে পাব না? নিজের মনেই বলে ওঠে সোমা। কিন্তু না, দেখে দরকার নেই। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই ভালো।

কতদিন সে যায় না ও বাড়িতে? বউদি তাকে কী ভেবেছেন, কে জানে!

এ বাড়ির কেউ কিন্তু জানে না ও বাড়ির খবর! সে যে কতদিন গেছে ও বাড়িতে, এরা কেউ তা জানে না! অভিজিৎকে নিয়ে গৌতম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, কিন্তু ওর কথা সে জানে না। এরা কল্পনাই করতে পারে না যে, কিন্তু, এসব কি হঠাৎ ভাবতে আরম্ভ করল সে আজ সকালে? সে সব তো ভেঙে গেছে। নিজের হাতেই সে ফেলেছে সব চুরমার করে।

চোখ দুটো হঠাৎ জ্বালা করে উঠলেও, নিজেকে সে সামলে নিল। না-না এমন করলে চলবে না। মায়ের মনের মত হতে হবে তাকে। মায়ের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে বাবার

জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে আসাই তার জীবনের একমাত্র সাধনা। যত কঠিন হোক না কেন, তা-ই সে করবে। আর তা ছাড়া, অভিজ্জিৎ তো মন্দ ছেলে নয়। সে সুপুরুষ, সে ধনী, সে প্রতিষ্ঠাবান।

নীচে নেমে এল সোমা সামান্য একটু প্রসাধন-পর্ব সেরে।

অভিজ্জিৎ বললে, গাড়ী নিয়ে এসেছি। আজ একটা হলি-ডে। যাবে ঘুরতে ?

মা বললেন, যাও না। বেড়িয়ে এস।

সম্মতি জানালো সোমা, বললে, চল।

শুরু হলো ঘোরা। সহর ছাড়িয়ে অবশেষে গ্রামাঞ্চলের নির্জন পথে। অভিজিৎ গাড়ির গতি একটু থামিয়ে, তার দিকে একটু ঝুঁকে বললে, প্রথম দেখেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আর, তুমি ?

এমন-কিছু অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ নয়, তবু কেমন যেন অবাক হয়েই ওর দিকে তাকিয়ে রইল সোমা। মনে হল, অভিজিৎ সত্যিই সুপুরুষ। এতো ঝকঝকে সুশ্রী চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। কথা বলে একেবারে তার সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী উইলির মত। ভাবতে-ভাবতে মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে পড়ে সোমা। বার্ণসের একটা গানের কলি আবৃত্তি করতে থাকে অভিজ্জিৎ, আর, তার বাণী যেন অভিভূত করে ফেলে সোমাকে। ধীরে ধীরে কখন যে ওর বাহুমূলে নিজেকে এলিয়ে দেয় সোমা, কে জানে।

নির্জন পথটার ওপরে হঠাৎ-ই থেমে যায় অভিজিতের গাড়ি। সে ষ্টিয়ারিং ছেড়ে দুহাতে সোমাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে, তারপরে মস্ত এক দানবের মত বার বার চুম্বন করতে থাকে ওর ঠোঁটে, গালে, কপালে।

—কী হচ্ছে! ছাড়ো আমাকে!

মুহূর্তে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল সোমা। সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। নিয়ে হঠাৎ-ই একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠে।

—সোমা।

—দোহাই তোমার, শীগগির ফিরে চল।

গাড়ি ফিরল।

সীটের একপাশে মুখ লুকিয়ে নির্জীবের মত পড়ে আছে সোমা।

গাড়ি যেন রুদ্ধশ্বাসে ফিরে চলেছে, আর তার মনে জাগছে আর এক সোমার কথা, যে সোমা ভিক্ষুনী, যে তপস্যা করেছিল পবিত্রতার, যে চেয়েছিল সম্যক জ্ঞান আর অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু, দুই আঙুল পরিমিত জ্ঞান দিয়ে নারী কি তা বুঝতে পারে? 'মার' এসেছে তার তপোভঙ্গ করতে। কিন্তু ভিক্ষুনীর তপোভঙ্গ অত সহজে হবে না, 'মার'কে ফিরে যেতেই হবে পরাজিত হয়ে।

বাড়ির কাছাকাছি আসামাত্র সোমা বললে, এখানেই থামাও। আমি নেমে যাব।

—বাড়ি পর্যন্ত যাব না?

—না। এটুকু আমি হেঁটেই যাব।

অভিজিৎ আর কিছু না বলে গাড়ি থামাল। নিশ্চুপেই নেমে দাঁড়াল সোমা। তারপরে, হাত তুলে নমস্কার জানাল অভিজিৎকে।

এরপরে, বাড়ি। না, তাদের বাড়ি নয়। পায়ে হেঁটে ঘুর পথে একেবারে ওদের বাড়ি।

—বউদি?

এতদিন পরে হঠাৎ ওকে দেখে একটু বুঝি অবাকই হলো বউদি, বললে, কী ব্যাপার সোমা!

দিনের বেলা সেই ঘরখানাতেই ওরা এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। কিন্তু, ঘরে কেউ নেই। টেবিলটা একেবারে ফাঁকা, একটা বইও পড়ে নেই ওর ওপরে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলে-উঠল সোমা, বার্নস আছে তোমার কাছে? 'An honest man's the noblest work of God,'—কোন কবিতায় আছে বলতে পার?

কিন্তু কণ্ঠে তো স্বর ফুটল না! সোমা বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই বসে পড়ল ওর সেই খাটটার একপাশে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বউদি কতদূর কী বুঝলেন কে জানে, বড় মৃদু আর কোমল কণ্ঠে ডেকে উঠলেন, সোমা!

সোমা বললে, দাদা কলেজে গেছেন বুঝি?

—না ভাই, বউদি বললে, আজ যেন কীসের ছুটি। উনি গেছেন ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে।

—আর সে? তোমার দেওর? প্রশ্নটা করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল যেন।

বউদি বললে, সে তো এখানে নেই ভাই। কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে গেছে গিরিডি!

—গিরিডি!

—হ্যাঁ।

—কেন!

—কে জানে! পাগলের খেয়াল বোঝা ভার।

সোমা বললে, গিরিডিতে আমার বড় জ্যোঠামশাই থাকেন।

বউদি বললে, খুব পণ্ডিত লোক। শুনেছ তো তোমার দাদা ওঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন? তা ছাড়া, বি-এ ক্লাসে ওঁর লেখা বই আমরা পড়েছি।

—তুমি! সোমা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছ বউদি?

লজ্জিত হয়ে বউদি বললে, ছাই। ও কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে আছে! তুমি বোস। অনেক দিন আস না কিন্তু।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সোমা বললে, হ্যাঁ, অনেকদিন। তোমার অর্ঘকুসুম আর অভ্রজ্যোতি কোথায় বউদি?

অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা দেখা দিল মায়ের মুখে। বউদি একটু হেসে বললে, ছেলেরা? আছে কোথাও। খেলছে দুজনে। ওরা একটু নিরিবিলি প্রকৃতির। হৈ-হুল্লোর মধ্যে নেই। বোধহয় বাপের ঘরে খাটের এক কোণে বসে পূজো-পূজো খেলছে। বুঝলে না তো? পুতুল-টুতুল সাজিয়ে পুজো হচ্ছে আর কী, নিজেরাই

পুরুত, নিজেরাই সব। চার পয়সার বাতাসা কিনে নৈবেদ্যও সাজানো হয়েছে বোধহয়। এস না ও ঘরে, প্রসাদ পাবে'খন?

সোমা ওর হাত দুটো ধরে ফেলল, বললে, বউদি, তোমরা সবাই ভালো। এত ভালো—এত ভালো কেন হলে তোমরা!

—ওমা, বলছ কী!

কিসের প্রতিক্রিয়া যে ঘটছিল সোমার মনের মধ্যে, বউদি তা জানে না। হঠাৎ-ই সোমা হেঁট হয়ে ওর দুটি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, তারপরে বিস্মিত-বিহ্বল বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সোমা বললে, আজ আর বসবার উপায় নেই। আজ চলি।

বলেই, মুখ ফিরিয়ে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চলে এল সোমা। ফিরে এলো নিজের বাড়ি।

মা বললেন, অভিজিৎ খুব ভালো ছেলে। কতদূর ঘুরে এলে? মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে আজ আর গৌতমের সঙ্গে গল্প নয়, শুয়ে বিশ্রাম কর। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে আজ বিশেষ প্রোগ্রাম আছে। আজ ব্লু ড্রেস করবে। অল্ ব্লু। ব্লুতে তোমাকে সুন্দর মানাবে, মিলি ডিয়ার!

বেশ কিছুদিন ধরেই এই নামে তাকে ডাকছেন মা। অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে এই নামে। তবু, আজ হঠাৎ সে চমকে উঠল মনে মনে। 'মিলি ডিয়ার!'—এই মায়ের কাছে সে তাঁর হারানো মেয়ে, মিলি। ওঁর দেখাদেখি ক্লাবের অন্য অনেকেই তাকে ডাকতে শুরু করেছে 'মিলি' বলে। আর, এটা বুঝতে বাকী নেই, এই মিলির জন্যই মিলির মায়ের সোসাইটিতে আজকাল এত নাম ডাক! তার রূপ এক আশ্চর্য কাজই করে চলেছে নগরীর অভিজাত-মহলে। বহু ছেলেই অভিজিতের ওপর ঈর্ষান্বিত।

ক্লাবে যেতে বা ক্লাব থেকে ফেরবার পথে মার সঙ্গে কথাবার্তা হয় কিছু-কিছু। একদিন উনি বলেছিলেন, দেখ, যে-যা প্রেজেন্ট তোমাকে দিতে চায়, গ্রহণ কোর।

একটু অবাক হয়েই সোমা প্রশ্ন করেছিল, কেন মা ?

—না নেওয়াটা বোকামী !—নেলী বললেন, শাড়ি, ইয়ারিং, যে যা দিতে চায়, নিও। একটু হাসির বিনিময়ে কিছু যদি পাওয়া যায়, তো ছাড়বে কেন ? 'woman to woman' কথা বলছি, অন্যভাবে নিয়ো না যেন কথাটা। আর তা ছাড়া, বোঝই তো আজকের ইকনমিক্ কন্‌ডিসন। তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন, অথচ, তোমারও দরকার অনেক কিছু।

সোমা বলেছিল, বাবা তো আমাকে সব কিছু দিয়েছেন, গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড় কিছুরই অভাব নেই। আপনিও দিয়েছেন প্রচুর। আর আমার কী দরকার মা ?

—ডোণ্ট্ টক্ রট্ !—নেলী একটু ধমকের সুরেই সেদিন বলেছিলেন, সোসাইটিতে চলাফেরা করার পক্ষে, তোমার যা আছে, তা এমন কিছু নয়। কোন উত্তর দেয় নি সোমা। যতদূর সম্ভব নিম্নকণ্ঠেই কথাবার্তা হচ্ছিল, সোফারের কাণ বাঁচিয়ে। সোফারটি আসলে মিস্টার সিনার, তাদের বাড়িরই আউট্ হাউসে সস্ত্রীক থাকে। দরকার মতো, ওঁদের গাড়ি চালায়। মিস্টার সিনার সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে এই ব্যবস্থাটা করে নিয়েছিলেন নেলী নিজে। মাসে-মাসে মাইনে হিসাবে কিছু টাকা সোফারকে দিতে হয়, নেপালী খৃষ্টান লোকটি, খুব অনুগত। এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট সস্তা পড়ছে সোফারের খরচ। আর মুখার্জি যখন গাড়ি বের করেন, তখন নিজেই চালান, তাঁর দরকার হয় না ড্রাইভারের।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পর সোমা সেদিন বলে উঠেছিল, আমার কিছু টাকা আছে মা ব্যাঙ্কে। নেবেন আপনি ?

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসেছিলেন নেলী, বলেছিলেন, রিয়্যালী ? কত ?

অঙ্কটা বলেছিল সোমা।

—তা হলে পাঁচ হাজার টাকা তোল দেখি কাল ?

তাই তোলা হয়েছিল। এবং সেই টাকা দিয়ে তার মা নিজের

জন্য কিছুই কেনেন নি, তারই গয়না, তারই শাড়ি, তারই ড্রেসিং টেবিল কিনে দিয়েছিলেন সেই টাকায়। অবশেষে সোমার অনেক পীড়াপীড়িতে একটা ইয়ারিং কিনেছিলেন শুধু নিজের জন্য। বলেছিলেন, এ সব কথা তোমার বাবাকে বলার দরকার নেই।

—আপনি খুশী হয়েছেন তো মা?—সোমা বলেছিল, এরপরে আর কারুর অহেতুক প্রেজেন্ট না নিলেও চলবে তো?

একটু হেসে নেলী বলেছিলেন, As you think best কিন্তু, অভিজিতের দিকে লক্ষ্য রেখ। ছেলেটিকে আমার ভালো লাগে। আমি বলে রাখছি, ও খুব উন্নতি করবে।

—আচ্ছা, মা?—সোমা বলে উঠেছিল, এই যে আমরা ক্লাবে যাই, বাবা আসেন না কেন? চুপচাপ—একা একা থাকেন। এখানে এলে তো সন্ধ্যাটা বেশ কাটে, না মা?

নেলী বলেছিলেন—Then you feel it too! তুমিও বুঝতে পারছ, ব্যথা আমার কোথায়! তোমার বাবা কিছুতেই আসবেন না। কারুর সঙ্গে মিশবেন না। একা একা থাকবেন। চিরদিন এই কাণ্ড! কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাটি করেছি কী কম! I am tired—awfully tired of it!

সোমা আর কিছু বলে নি সেদিন।

কিন্তু, আজ? আজ সন্ধ্যার আগে টয়লেট্ করা শেষ করে,—নিজের হাতেই টয়লেট করে সে আজকাল, নিজের ঘরে, নিজের ফ্যান্সী ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসে—ব্লু ড্রেস পরতে গিয়েও পরতে পারল না সোমা। বললে, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন মা।

—এদিকে আজ অভিজিৎ নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। বসে আছে নীচে, ড্রয়িংরুমে। কোন রকমে পারবে না যেতে?

সোমা উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি ওর সঙ্গে নিজে দেখা করে কথাটা বলে আসছি। বড্ড ক্লান্ত লাগছে আজ।

সাধারণ লাল একটা শাড়ি পরণে ছিল ওর। মা সেদিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠলেন, এইভাবে যাবে?

—তাতে কী হয়েছে! সোমা বললে, ও কিছু মনে করবে না।

নীচে, গৌতমের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিল অভিজিৎ। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর সোমা জানাল তার অক্ষমতার কথা। বোধহয় প্রবলভাবে নিরাশ হল অভিজিৎ, বললে, যাবে না তুমি!

—না। শরীরটা—

ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে অভিজিৎ, ডাক্তার—?

—না। ডাক্তার নয়। বিশ্রাম।

একটুক্ষণ নীরব থাকবার পর অভিজিৎ বললে, বেশ। মাসীমা যাবেন তো?

—হ্যাঁ।

—অপেক্ষা করি?

—বেশ।

সোমা ঠিক তখনি চলে আসতে পারল না। অভিজিৎ বললে, একবার বাইরের বারান্দায় একটু আসবে? একটা কথা আছে।

গৌতম তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অভিজিৎ বললে, না-না, তুমি বস। আমি তোমার দিদিকে একটু-মানে একটা জরুরী কথা, ঠিক এক মিনিট!

গৌতম আবার বসে পড়ল সোফায়, বললে, ঠিক আছে। এসে কিন্তু এডিনবরার গল্পটা শেষ করতে হবে।

—নিশ্চয়ই।

সোমার কিন্তু অদ্ভুত লজ্জা করছিল, ঠিক এই মুহূর্তে গৌতমের সামনে দিয়ে অভিজিতের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে। নির্জন বাইরের বারান্দা। বেতের দুটো-তিনটে চেয়ার পড়ে আছে একপাশে বেতের গোল একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে। সেই ভাইজাগের চেয়ার, যাতে সেই প্রথম দিনটিতে এসে বসেছিল সোমা।

বারান্দার থামগুলোতে সবুজ লতাগুলি এতদিনে অনেকটা দূর পর্যন্ত লতিয়ে উঠেছে।

অভিজিৎ বললে, চুপিচুপি একটা কথা বলতে চাই।

সোমা একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ কেন, কণ্ঠে স্বর ফুটল না সেই মুহূর্তে।

অভিজিৎ প্রায় ফিসফিসে সুরে বললে, লণ্ডন থেকে তোমার মার চিঠি পেয়েছি।

বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। বিস্মিত, বিহ্বল হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সোমা।

—অবাক হচ্ছ বোধহয়। অভিজিৎ বললে, বাবার সঙ্গে রাজকুমার সিদ্ধান্ত মশায়ের খুব বন্ধুত্ব। আমি তাঁকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকি। বিলেতে আমি তাঁরই চেষ্টায় ভাল 'Rooms'-এ থাকতে পেরেছিলাম, একেবারে কেন্‌সিংটনে। তাঁর চিঠি নিয়েই তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?

সোমা নিরুত্তর। অভিজিৎ আবার বললে, তাঁকে চিঠি লিখেই তোমার মায়ের ঠিকানা জানতে পেরেছিলাম। আর জানতে পেরেই, তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম আমি। নিজের পরিচয় দিয়ে, একথাই বলতে চেয়েছিলাম, আমি যদি সোমার পানিগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করি, আপনি কি আমাদের আশীর্বাদ করবেন? এই দেখ, তার উত্তর এসেছে। পড়তে পারবে? দাঁড়াও আলোটা জ্বেলে দি। বস না এসে এই চেয়ারে?

চিঠিটা হাতের মুঠির মধ্যে পেয়েও হাতটা কাঁপছে। কোনক্রমে চেয়ারে বসে পড়ে চিঠির ভাঁজটা খুলল সোমা। অভিজিতও আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বসেছে তার পাশে। বলল, ভেব না, গৌতমকে এসব কথা কিছু বলি নি। কাউকেই বলি নি, বলবও না।

সোমা এতক্ষণে কথা বলল, ক্লাবে তো একথাই রটনা যে, আমার সেই ইয়োরোপীয়ান মা মারা গেছে। সবাই জানে।

আমিও তাই জানতাম! অভিজিত বললে, কিন্তু, একদিন মিউ-নিসিপ্যাল মার্কেটে ফুল কিনতে গিয়ে হঠাৎ-ই সুমনাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জান তো, ওঁদের বাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছেই।

—জানি। কিন্তু আলাপ হল কবে?

অভিজিৎ বললে, ওকে সঙ্গে নিয়েই তো আমাদের বাড়ি প্রথম তুমি গিয়েছিলে চিঠি হাতে। মনে নেই বুঝি? তারপরে নিজের গরজেই ওঁর সঙ্গে আলাপটা করে রেখেছিলাম। উনিই বলেছিলেন তোমার মায়ের কথা।

—গরজ? গরজের কথা কেন?

—অগত্যা। তোমার সব কথা শোনবার জন্য। তোমার কথা আরও জানবার জন্য।

—কেন?

—কেন, সে কী বুঝতে তোমার বাকী আছে?

সোমা আর কিছু বলল না। তার মায়ের চিঠিটা ততক্ষণে পড়া হয়ে গেছে। ইংরাজীতে টাইপ করা ছোট্ট চিঠি। মা যা লিখেছে, তার অর্থ হল এই, তোমার সব কথা জেনে খুশী হলাম। সোমাকে আমি যথাযোগ্য স্থানে সঁপে দিয়েছি। ওর সম্বন্ধে ভাববার আমার আর কিছু নেই। কী যে ওর বরণীয় পথ, তার নির্দেশ ও খুঁজে নেবে ওর নিজের অন্তর থেকেই। এবং ওর অন্তর-নির্দেশিত সেই পথ-অবলম্বনের ক্ষেত্রে তার মায়েব আশীর্বাদ বিস্তৃত থাকবে। চিরকালের জন্যই······

সোমার মনে হল, এ-চিঠি অভিজিতকে নয়, এ-যেন একেবারে তাকে লেখা, তার জন্য লেখা। একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বললে, চিঠিটা আমি পেতে পারি?

অভিজিৎ বলে উঠল, চিঠিটা তুমি নিজের কাছে রাখতে চাও? বেশ তো। রেখে দাও।

ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সোমা, দুটি চোখে বড় স্নিগ্ধ দৃষ্টি, যেন বলতে চায়, এর জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম।

অভিজিৎ বললে, চল, ভিতরে যাই? গৌতম একা বসে আছে সেই থেকে। ওর সঙ্গে গল্প করি বসে, তুমি ওপরে গিয়ে তৈরি হয়ে এস। আজ ক্লাবের স্পেশাল ফাংশন। মনে আছে তো?

সোমা বললে, আজ ক্ষমা করতে হবে। আমি যেতে পারব না।

—সে কী!

—না।

—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, না কেন?

সোমা বললে, শরীরটা ভাল নেই। তুমি এসেছ নিজে, মাকে নিয়ে যাও।

স্থানুর মত নিথর নীরব দাঁড়িয়ে রইল অভিজিৎ।

সোমা মৃদু কণ্ঠে বললে, আমাকে ক্ষমা কর।

তারপরেই দ্রুতপায়ে ওর কাছ থেকে সরে এল সোমা। এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই হল, সোমা গেল না। মা একাই গেলেন অভিজিতের গাড়িতে।

গাড়ি ছেড়ে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ সে বসে ছিল ড্রয়িং-রুমে। গৌতম বলেছিল, গেলে না কেন দিদি?

—এমনি।

গৌতম উঠে দাঁড়াল, বললে, আমিও তো এখন বেরুব এক বন্ধুর বাড়ির দিকে। তুমি একা-একা এ-ভাবে বসে থাকবে নাকি?

—থাকব।

—থাক।

বলে গৌতম কিছুটা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এল, বলল, তার চেয়ে ওপরে যাও না, বাবার কাছে? বেচারী একা-একা থাকে।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সোমা, কিন্তু কিছু বলল না, আবার মুখ নীচু করে যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে রইল। গৌতম চলে গেল বাইরের দিকে।

এরও অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত চুপচাপ একইভাবে বসে নিজের মনে

কী যেন ভাবছিল সোমা। তারপরে, একসময় উঠে ওপরে এল। প্রথমেই নিজের ঘরে। মুখের রঙ উঠিয়ে, শাড়ি বদলে সাদা একটা শাড়ি পরে, স্বাভাবিক চেহারায় তার জানলাটির কাছে এসে দাঁড়াল সে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ওদের সেই জানলাটি অন্ধকার। আলোর এতটুকু রেখাও ফুটে নেই সেই জানলাটিকে ঘিরে। নিষ্ঠুর-নিশ্ছিদ্র-অন্ধকার ওখানে বিরাজ করছে শুধু।

ওখান থেকে সরে এসে তার বাবার ঘরের দিকে চলতে শুরু করল সোমা। ঘবের কাছে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। ওঁর ঘরও অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যে। মনে হল, কতদিন বাবা নিজে থেকে ডাকেন না তাকে!

পায়ে-পায়ে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সোমা। একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচের পর অবশেষে মৃদু কণ্ঠে সে ডেকে উঠল, বাবা!

ভিতর থেকে সাড়া এল, কে!

বেড-স্যুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ। চুপচাপ শুয়ে ছিলেন তিনি বিছানায়। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তারপরে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দরজায় দেখতে পেলেন সোমাকে। অবাকই হলেন। বললেন, এ কী! যাও নি তুমি?

—না বাবা।

—কেন?

কোনও উত্তর এল না দরজার কাছ থেকে।

উনিও আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

একটুক্ষণ নির্বাক থেকে তারপরে কোমলকণ্ঠে বলে উঠলেন, এস, কাছে এস।

আস্তে আস্তে ওঁর কাছে এসে দাঁড়াল সোমা।

উনি বললেন, বস।

বসল না সোমা, ওঁর আরও একটু কাছে গিয়ে, ওঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে সোমা বললে, আপনি কেন আমাদের সঙ্গে যান না বাবা ?

—কোথায় ?

—ক্লাবে।

কালো একটা ছায়া খেলে গেল ওঁর মুখের ওপর দিয়ে। উনি বললেন, ভালো লাগে না।

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কেটে যাবার পর, হঠাৎ-ই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল সোমা, আমারও যে ভালো লাগছে না বাবা! ওর চোখ দুটি যেন আবার হয়ে উঠল স্নেহ-কোমল, উনি মুখটা একটু ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ-ই টেনে নিলেন ওঁর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে। তারপরে, মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, বাসন্তী!

হাতখানি কেঁপে উঠল সোমার।—বাসন্তী!

মুখার্জি নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, যে-মেয়েকে আমরা হারিয়েছি, তার নাম সে নিজেই দিয়ে ছিল, বাসন্তী। সবার আড়ালে সেই নামেই তাকে আমি ডাকতাম। সে খুব খুশী হত।

—বুঝেছি বাবা!—অস্ফুট কণ্ঠে সোমা বললে, আপনিও আমাকে ডাকবেন 'বাসন্তী' বলে।

—তাই ডাকব রে, তাই ডাকব!—মেয়ের একটা হাত তাঁর হাতের মধ্যে, সেই হাত দিয়ে ওকে নিজের আরও কাছে টেনে নিয়ে অন্য হাতটি দিয়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন মুখার্জি। তারপরে, এক সময় বললেন, ও সব ক্লাব-ট্লাব তুমি ছেড়ে দাও। তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। আগের মত হয়ে ওঠ আবার।

—তাই-ত আমি হতে চাই।

ওঁর স্নেহস্পর্শে সমস্ত শরীরটা যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছে সোমার। কী এক অদ্ভুত আবেগ এসে যেন আচ্ছন্ন করল ওর সারাটা মন! সে ওঁর হাতের ওপরে নিজের মুখখানা চেপে ধরল হঠাৎ। তারপর কেমন এক কান্না-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল সোমা, কিন্তু, কী করব

বাবা! মা যদি রাগ করেন! মা যদি আবার আপনার সঙ্গে সেই রকম অশান্তি শুরু করেন! আমি কেমন করে সহ্য করব?

সোজা হয়ে এবারে বসলেন মুখার্জি, বললেন, সেই অশান্তির দাহ থেকে আমাকে রক্ষা করবার জন্য এই সব করছিলে বুঝি তুমি?

সোমা কোনও উত্তর দিতে পারল না। তার দুটি ছলোছলো চোখ ছাপিয়ে দু ফোঁটা জল ভেঙে পড়ল গালের ওপরে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

মুখার্জি বললেন, তুমি জান না, এ অশান্তি তার চেয়েও বেশী। এ যে নীরব যুদ্ধ চলেছে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর! তুমি হয়ত সব বুঝবে না, তবু বলি। আমার বাসন্তীকে সে 'মিলি' করে তুলতে চায়, আর, তার 'মিলি'কে আমি করে তুলতে চাই বাসন্তী। বুঝতে পারছ? তুমি 'মিলি' হলে, সে খুশী থাকবে, আমি দুঃখ পাব। আর, তুমি বাসন্তী হলে, আমি খুশী হব, সে দুঃখ পাবে।

কান্না, বুক ঠেলে আরও কান্না আসছিল কথাটা শুনে। রুদ্ধকণ্ঠে সোমা বললে, এ ক্ষেত্রে আমি কী করব বাবা?

এ প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে পারলেন না মুখার্জি।

সোমা বললে, আমি ফিরে চলে যাই লণ্ডনে। কিম্বা, এই দেশেই, অন্য কোথাও। আমার পক্ষে চাকরি পাওয়া কঠিন হবে না, বাবা!

—না-না! মুখার্জি তাড়াতাড়ি ওর হাতখানা চেপে ধরলেন আবার। বলে উঠলেন, নেলী পেয়েছে তার হারানো মেয়েকে। তুমি গেলে তার দুঃখের অবধি থাকবে না।

চুপ করে রইল সোমা।

কিন্তু, তারপর থেকে যা শুরু হল, তা এক বিচিত্র কাহিনী। সে নিজে তার মধ্যমনি হলেও, মনে হল, তার কিছু করবার নেই, নীরব দর্শক সে শুধু।

আগের মতই আবার তার বেশবাস, আগের মতই উদাসিনী

সে। মা বললেন, এ কী! তৈরি হও নি যে? বিকেল হয়ে গেল! আজও আসবে অভিজিৎ। আজও কী যাবে না?

—না, মা।

—আজও কী শরীর ভাল নেই?

অল্প একটু হেসে সোমা বললে, হ্যাঁ তা বলতে পারেন।

আর কিছু প্রশ্ন করলেন না সেদিন নীলিমা।

কিন্তু, তার পরের দিন? তারও পরের দিন?

না। আর কোনও ক্লাব নয়, আর কোনও সোসাইটি নয়, আর কোনও তথাকথিত বিলাতী সমাজের নকলনবিশীও নয়। মা বললেন, অভিজিৎ এসেছে গাড়ি নিয়ে। না হয় ওর সঙ্গে একটু বেড়িয়েই এস।

—না, মা।

তীব্র দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকালেন নিলীমা, তোমার কী হয়েছে, সত্যি করে বল।

—কই, কিছু না ত।

—কিছু না ত! নীলিমা ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠেই পুনরাবৃত্তি করলেন. ওর কথার। বললেন, সত্যি করে বল, কে তোমাকে কী পরামর্শ দিয়েছে?

নিরুত্তরে মুখখানা নীচু করল সোমা।

নীলিমার কণ্ঠস্বর তখনও তীব্র। বললেন, ক্লাবেও আর তুমি যাবে না?

—না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নীলিমা বললেন, বুঝেছি, তোমার পরামর্শদাতা কে!

বলেই আর দাঁড়ালেন না, তার ঘর থেকে চলে গেলেন মুখার্জির ঘরে। অতএব, আবার দেখা গেল নীলিমাকে তাঁর পূর্বতন মূর্তিতে। শুরু হল আবার সেই তীব্র কলহ। নেলী স্বামীকে বললেন, এর জন্য তুমি দায়ী! তুমিই ওকে দিয়েছ এসব মন্ত্রণা! ছিঃ-ছিঃ!

সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে, ও না গেলে? আমার স্নেহের মর্যাদাও ও মেয়ে বুঝল না?

এমনি প্রতিদিন। রোজই তাকে নিয়ে যাবার জন্য জেদ ধরেন নীলিমা। সোমা কিছুতে যেতে চায় না, টয়লেটও করতে চায় না, শক্ত হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় তার নিজের ঘরের সেই পূর্বদিককার জানলাটার কাছে। পর্দা সরিয়ে, বাইরে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করে, আর তার সেই অদ্ভুত অনমনীয়তা লক্ষ্য করে নীলিমার সমস্ত উত্তেজনা আর বিক্ষোভ গিয়ে ভেঙে পড়ে মুখার্জির ওপরে।

কোনও কোনও দিন চুপ করেই থাকেন তিনি, নীলিমার উত্তেজিত তীব্র কণ্ঠস্বর এক সময় সে শান্ত গাম্ভীর্যের কাছে হারই মেনে নেয়। আবার, কোনও কোনও দিন আর সহ্য করতে পারেন না, বেধে যায় কথা-কাটাকাটি, এবং পরিণামে, তুমুল কলহ।

ছুটে আসে আয়া আর বেয়ারা। কিন্তু লজ্জায় মরে গেলেও মুখ ফুটে সোমা যে বলতে পারে না, 'আমি যাব।'···

তার মন অবশ্য চায় না যেতে। তবু, এ নির্লজ্জ কলহ পরিহার করবার জন্যই সে মনে মনে বলতে চায়, যাব আমি ক্লাবে, মায়ের সঙ্গে, অভিজিতের সঙ্গে।

কিন্তু, বাবার তা ইচ্ছা নয়। বারবার তিনি চীৎকার করে স্ত্রীকে বলতে থাকেন, না, বাসন্তী যাবে না।

শুনে শুনে একদিন কেঁদেই ওঠেন নীলিমা, বলেন, তোমারই বাসন্তী? আমার তো কেউই নয়?

সোমার বুকের ভিতরটা কী-এক আশঙ্কায় যেন ঢিপঢিপ করতে থাকে।

তীব্রস্বরে কী যেন বলে ওঠেন তার বাবা। কান্না আর উত্তেজনা মিশিয়ে অদ্ভুত বিকৃত শোনায় নীলিমার কণ্ঠস্বর। বলেন, ওকে যেতে দিচ্ছ না, সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারছি না! সবাই বলে, তোমার মেয়ে কই? উত্তর দিতে পারি-না। আমার দাম যে কত

কমে যাচ্ছে সোসাইটিতে, সেটা স্বামী হয়ে তুমি বুঝতে চাইছ না কেন ?

—না-না, আমি বুঝব না, বুঝতে চাইও না ! ও আমার মেয়ে, একান্তভাবেই আমার মেয়ে। ওকে শান্তিতে থাকতে দাও !

—কী বললে ! নীলিমা গর্জে ওঠেন এবার, আমি ওর শান্তিভঙ্গ করছি ? ডাক-ডাক তোমার শয়তানী মেয়েকে ! মুখোমুখি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তোমারই সামনে।

—না, তুমি তা কখনও পারবে না ! চীৎকার করে ওঠেন তার বাবা, তার ওপর তোমার কোনও অধিকার নেই।

এইভাবে, ওপরে চলতে থাকে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আর নীচে নিথর হয়ে বসে থাকে গৌতম আর অভিজিৎ। নিশ্চয়ই অভিজিৎ শুনতে পাচ্ছে সমস্ত কথা। কিন্তু, কী লজ্জা !

সে কি চুপচাপ নীচে চলে যাবে ? অভিজিতকে গিয়ে বলবে বুঝিয়ে সব কথা, যাতে সে না কিছু মনে করে ? কিম্বা বলবে, চল তুমি আমাকে নিয়ে তোমার মটরে, কোথাও বেড়িয়ে আসতে !

তারা বেরিয়ে গেছে শুনলে মা খুশী হবেন, কিন্তু বাবা ? বাবার ঘটবে পরাজয়। মনে প্রবল আঘাত পাবেন বাবা। তবুও দেখা যাক। অন্ততঃ অভিজিতকে একান্ত ডেকে নিয়ে কথা বলায় কোনও দোষ নেই !

কিন্তু, সবার অলক্ষ্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অন্য এক চিন্তা এসে অতর্কিতে অধিকার করল তার মন। কী সে বলবে অভিজিতকে ? তাকে বুঝিয়ে বলার আর কী থাকতে পারে সোমার ? তার চরম প্রত্যাখ্যানের বাণী কী পৌঁছয় নি এখনও অভিজিতের অন্তরে ?

পরক্ষণেই মনে হল, তার অন্তরের সংবাদ নিয়ে এ-বাড়িতে ব্যস্ত কে ? কে জানে তার সত্যিকার মনের খবর ? ওরা শুধু বাসন্তী আর মিলিকে নিয়েই ব্যস্ত।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে, একটু দাঁড়িয়ে ম্লান একটু হাসলে

সোমা। বাবা চান বাসন্তীকে, গৌতমও চায় তার নিজের হারান দিদিকে। আর, নীলিমা খুঁজে বেড়ান মিলিকে। অভিজিতও তো চায় সেই মিলিকেই। এদিকে মিলি আর বাসন্তীর দোটানার মধ্যে পড়ে যে বিস্মরণীয়া জীবটি আর্তনাদ করে উঠতে থাকে, সে—সোমা।

এই সোমার খবর কে রাখে? সোমা ড্রয়িং-রুমের দিকে পা না বাড়িয়ে অন্য পথ ধরে। চলে আসে সেই ক্যানেলের ধারে। সেই ক্যানেল, সবই ঠিক তেমনি রয়েছে। সেই গাছতলা, সেই মাটি-কাটার লোকগুলি। কিন্তু শুধু সে-ই নেই। সেই বিচিত্র অভিমানী লোকটি।

সবার অলক্ষ্যে, আজ এতদিন পরে, সোমা ছুটে যায় পাশের সেই বাড়ির দিকে, সেই স্নেহশীলা বউদিটির কাছে। গিয়ে প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতেই বলে, বউদি?

বউদি দুহাতে ওকে কাছে টেনে নেয় তাড়াতাড়ি। বলে, কী হয়েছে সোমা!

সোমা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, বলে, আমাকে তুমি বাঁচাও বউদি, আমাকে তুমি বাঁচাও!

অবাক হয়ে বউদি প্রশ্ন করে, কী বলছ তুমি!

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সোমা বলে, গিরিডি থেকে তাকে শীগগির আসতে লিখে দাও। আমি আর সইতে পারছি না যে!

কী এক অপূর্ব বিভায় ঝলোমল করতে থাকে বউদির মুখখানা। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বউদি শুধু বলে, আমি জানি রে, আমি জানি।

সাত

দিনের পর দিন যায়। মুখার্জির সংসারে অভাবনীয়রূপে হঠাৎ-ই ঘটে যায় সেই অঘটন।

সব শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন নীলিমা, তারপরে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, অতি বড়ো দিব্যি রইল, যদি ও মেয়ের তুমি আর মুখদর্শন কর।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন মুখার্জি, বেশ। তাই হবে।

সোমা নেই।

হঠাৎ-ই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পড়ে আছে শুধু তার একখানা চিঠি, "বাবা, আপনাকে ছেড়ে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু যেতে হবে, কোনও উপায় নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া কোনও পথ ছিল না আমার। আপনি কিন্তু দুঃখ করবেন না, আমি যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি। আমি পেয়েছি খুঁজে আমার ভারতবর্ষকে। যেমন করে আমার মাকে ভুলে গেছেন, তেমনি করে আমাকেও ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন, কোথাও আমার কোনও সন্ধান করবেন না।"

—না মা, কোন সন্ধানই তোমাদের করি নি, করবও না।—নিজের নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে থাকেন মুখার্জি। প্রথম যৌবনে যা একদিন আমি করেছি, তার হিসাব আমাকে ক্রান্তিতে ক্রান্তিতে মিলিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

বিলেতে গিয়েছিলেন জাহাজের কাজ শিখতে বাবার নির্দেশে, কিন্তু মনে ছিল চিরকাল কাব্যের তৃষ্ণা। সে-কথা এ সংসারে একমাত্র যিনি বুঝতেন, তিনি বড়দা। বড়দা, বাবাকে বলতেন,

সুধীরকে Scienceএ দেবেন না বাবা, ও মনে-প্রাণে আর্টের ছাত্র।

বাবা তা শোনেন নি একেবারেই। ধমকে উঠেছিলেন বড়দাকে।

সেই গ্লাসগোর বরফ-পড়া দিনগুলি। দুজনে মিলে সেই রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠ। আজ সেই "ঋণশোধ"-এর "উপানন্দ"-এর কথা মনে হচ্ছে।—পংক্তির পর পংক্তি লিখছি, ছুটীর পর ছুটী পাচ্ছি!...

এই পঁচিশটি বছর ধরে আমিও প্রতিটি দিন ধরে জীবনের ঋণ শোধ করে চলেছি, আর ছুটীর পর ছুটী পাচ্ছি!—আর যতদিন বাঁচব, আমার কেবল ছুটী—ছুটি—আর ছুটী!

সোমা নেই, সমস্ত বাড়িটাই বুঝি নিথর নিঃঝুম হয়ে গেছে। গৌতম কলেজে পড়ে। নিঃশব্দে সে কখন আসে, কখন যায়, টেরও পাওয়া যায় না। জনকয়েক বন্ধু জুটিয়ে যে বসবার ঘরে বসে গল্প করবে, তাও সে কখনও করে না!

আর, নীলিমা! যেন কঠিন এক অসুখ থেকে উঠেছেন। বিশীর্ণ, পাণ্ডুর চেহারা। বৈকালীন প্রসাধন শেষ করে ছায়ামূর্তির মত এসে একদিন দাঁড়ালেন মুখার্জির হেলান-দেওয়া চেয়ারটার মাথার কাছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে রইলেন মুখার্জি তার মুখের কথা শোনবার জন্য, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে অবশেষে তিনিই মুখ ফেরালেন ওর দিকে, প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবে?

—না।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, ক্লাবে যাবে না?

—না।

—কেন?

ঘুরে, সামনের দিকের একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল নীলিমা, ঈষৎ তীব্র আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, কোন মুখ

নিয়ে যাব বলতে পার? অভিজিতের সামনে মুখ দেখাব কেমন করে? সেদিন সে এসেছিল। যেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে!

—কেন?

—কেন! বিস্ময়াবিষ্টের মত বলে উঠলেন নীলিমা, জগৎ-সংসারের কী কোনও খবর রাখবে না তুমি? অভিজিৎ চেয়েছিল ওকে বিয়ে করতে।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন মুখার্জি। এ সম্ভাবনার কথাও তো তাঁর কাছে অপরিজ্ঞাত থাকবার বিষয় নয়। সোমাকে টেনে টেনে নীলিমার ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝেছিলেন এমন একটা কিছু সংঘটন ঘটে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু হবে না। আর অভিজিতকেও তো দেখেছিলেন তিনি। এই বাড়িতেই দেখেছিলেন কতবার! অপছন্দের ছেলে তো নয় সে! সোমা তবে হঠাৎ এ সমস্ত বন্ধন কেটে চলে গেল কেন?

'আমি পেয়েছি খুঁজে আমার ভারতবর্ষকে!'

কোন ভারতবর্ষকে তুমি খুঁজে পেয়েছ মা? অভিজিতদের মধ্যে যে ভারতবর্ষকে দেখেছিলে, সে কী তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষ নয়? যদি না হয়ে থাকে তো, পেয়েছ তুমি সে কোন অমৃতের স্পর্শ, যা থেকে এ নিঃসঙ্গ মানুষটিকেও তুমি বঞ্চিত করে গেলে? তার ছোঁয়া কী আমিও পারি না পেতে। কোথা থেকে হঠাৎই এলে তুমি, তোমার আর আমার পথ সবার অলক্ষ্যে কখন হয়ে গেল এক, তোমার সাধনার মধ্যে আমি খুঁজে পেলাম মুক্তির এক অভূতপূর্ব আস্বাদ, কিন্তু হঠাৎই আবার সে পথ গেল আমার থেকে বেঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন নিরুদ্দেশের দিকে উধাও হয়ে!

'যেমন করে আমার মাকে ভুলে গেছেন, তেমনি করে আমাকেও ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন, কোথাও আমার কোনও সন্ধান করবেন না।'

তবে কী সুজাতা শেষ পর্যন্ত এসেছে ভারতবর্ষে? সবার অলক্ষ্যে একদিন যোগাযোগ করেছে মেয়ের সঙ্গে, নিশ্চুপ

ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেছে তার মেয়েকে তার নিজের কাছে? কে জানে!

ততক্ষণে সামনের চেয়ারখানায় বসে পড়েছেন নীলিমা, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী? চুপ করে রইলে যে? একটু যেন চমকেই উঠলেন মুখার্জি, তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বলব কী? বলার কিছু নেই।

নীলিমার চোখে প্রখর সেই দৃষ্টি, বললে, নেই! খোঁজ করবে না মেয়ের?

মুখার্জি একটু হাসলেন, বললেন, ও-মেয়ের কি মুখ দর্শন করা উচিত? তুমিই বল?

যেন চাবুকের তীব্র কশাঘাত পেয়েছেন, এমনি ভঙ্গিমায় সোজা হয়ে বসলেন নীলিমা, তাকালেন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে, তারপরে তুটি চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে, কোনক্রমে কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বললেন, আমার কথা যে ফিরিয়ে দিয়ে আবার এমন করে আমাকেই তুমি মারবে, তা আমি ভাবি নি!

বলতে বলতে তুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন নীলিমা। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আমার মুখের কথাটাই ধরলে, মনের কথাটা ধরলে না! ওগো, সে যে আমার মিলি, আমার মিলিকেই যে ফিরে পেয়েছিলাম ওর মধ্য দিয়ে!

স্থাণুর মত বসে রইলেন মুখার্জি। ওঁকে শান্ত করতেও চেষ্টা করলেন না, সান্ত্বনা দেবারও প্রয়াস করলেন না। বরং ওঁর মনে হল, ও কাঁতুক, কেঁদে কেঁদে ওর জমানো তুঃখের ভার ও কিছুটা লাঘব করুক।

পরের দিন বিকাল শেষ হয়ে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্পর্শ এসে লেগেছে আকাশে। সিনহা সস্ত্রীক এসে কিছুক্ষণ গল্প করে এইমাত্র চলে গেল। মালবিকাই বোধ হয় প্রথম তুলেছিলেন কথাটা। কিন্তু কোথায় গেল মেয়েটা? কার সঙ্গেই বা ছিল ওর আলাপ?

মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিলেন নীলিমা। উত্তর দিতে

হয়েছিল মুখার্জিকেই। বলেছিলেন—সন্ধান করতে সে বারণ করে গেছে।

—কিন্তু, সে বারণ কি আপনার শোনা উচিত বাপ হয়ে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপরে উত্তর দিলেন মুখার্জি—বোধহয় উচিত। বাপ হয়ে কী আর তাকে দিতে পেরেছি? সেইজন্যই তার স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ আমি করতে চাই না। আর তাছাড়া, যে মায়ের সে মেয়ে, তাতে কোনও অন্যায় সে কখনও করতে পারে না।

এ কথায় চট করে মুখ তুললেন নীলিমা, তারপরে, কী হলো তাঁর মধ্যে কে জানে, হঠাৎ-ই উঠে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। সিনহা আর মালবিকা উভয়েই তা লক্ষ্য করে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলেন নিজেদের। সিনহা তার স্ত্রীকে বললেন—এসব কথার উত্থাপন করাই তোমার উচিত হয় নি।

মালবিকা লজ্জিত ভঙ্গিমায় মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—মাপ করবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মুখার্জি—না-না, কী মুশকিল! তা কেন? ও হয়ত রাগ করেছে আমার কথায়। সোমার মার কথার উল্লেখ ওর পক্ষে স্বভাবতই সহ্য করতে পারা সম্ভব নয়।

ওঁরা কোনও উত্তর দিলেন না। একটু পরেই বিদায় নিলেন ওঁরা দুজনে।

ওঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নীলিমা, বললেন—অমন মায়ের মেয়ে কোনও অন্যায় করতে পারে না, কে তোমায় বলেছে? এভাবে উধাও হয়ে যাওয়া অন্যায় নয়? সোসাইটির কাছে আমাদের মুখে চুণকালি দেওয়া নয়? ওই রকম মায়ের মেয়ে বলেই তা পেরেছে? আমার মিলি হলে কি সত্যিই সে তা পারত? কখনই না।

নিরুত্তরে স্তব্ধ হয়ে রইলেন মুখার্জি।

কোথা থেকে কী ভাবে যেন খবর পেয়ে পরদিন সুমনা এসে উপস্থিত। সাদা শাড়ি পরণে, একটু রোগা হয়ে গেছে যেন ও। মুখার্জি বললেন—জামাই কোথায়?

—এখানে নেই। আউট্‌ডোর স্যুটিংয়ে গেছে।

—কোথায়?

—সেই আসাম। কাজিরাঙ্গা ফরেষ্টে। কিন্তু কাল ও-বাড়ি গিয়ে মার কাছ থেকে কী শুনলাম?

—কী শুনেছিস?

সুমনা বললে—সোমা নাকি নিরুদ্দেশ?

মুখার্জি বললেন—খবরটা চমৎকার ছড়িয়ে গেছে ত!

—তা যাক—সুমনা বললে, তুমি ত আমাকেও জানাও নি কাকু? কোথায় গেল ও?

—জানি না।

—কিন্তু, জানতে ত হবে।

—বোধহয় না। চিঠিতে 'সন্ধান করবেন না' বলে লিখে গেছে।

সুমনা চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে নিজের মনেই বলে উঠল—আমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব সেই আমাকেই জানাল না একবারও? ব্যাপারটা কী? দাঁড়াও, আমিই দেখছি।

দুদিন পরে সুমনা আবার এল। এবারও একা। বললে—কাজিরাঙ্গা ফরেষ্ট থেকে মানুষটি এখনও ফেরে নি। জান কাকু?

—কী?

ওর কাকীমাও বসেছিল কাছে। তার দিকে তাকিয়ে বললে—তুমিও শোন কাকীমা। কাল মিষ্টার বোসের বাড়ি, অর্থাৎ অভিজিতবাবুদের বাড়ি থেকে এক বিচিত্র সংবাদ পেয়েছি। অভিজিতবাবুর বাবা অর্থাৎ মিস্টার বোসের এক বন্ধু এসেছেন বিলেত থেকে। মিস্টার সিদ্ধান্ত। তিনি নাকি সোমাকে খুব চিনতেন।

অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন মুখার্জি—মিস্টার সিদ্ধান্ত!

তারপরে স্বাভাবিক কণ্ঠে—সিদ্ধান্তের কথা সোমার মুখে শুনতাম বটে।

সুমনা বললে—তাঁর কাছে যায় নি ত সোমা! আমি খোঁজ করছি। ওঁর ঠিকানা আমি নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।

—কিন্তু তাতে লাভ কী সুমনা!—মুখার্জি বললেন—যে এ-ভাবে চলে গেছে, তাকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবে?

—না পারি, খোঁজটাও ত পাব!

—তাতেও লাভ নেই। মুখার্জি আশ্চর্য দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—কারণ যা ভাবছি তাই যদি সত্যি হয়ে দাঁড়ায়? যদি সে তার মার কাছে গিয়ে থাকে? অর্থাৎ যদি সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওর মা-ও এসে থাকে ভারতবর্ষে?

দুটি বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীলিমা, তারপরে কাঁপা গলায় বলে উঠলেন—কী বললে! সে-ও এসেছে!

—ভয় নেই তোমার!—মুখার্জি বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি কোথাও সন্ধান করতে যাব না। হয়ত খুঁজলে সোমাকে পাব, কিন্তু আমার বাসন্তী?

—মিলি!—বলে চীৎকার করে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে আবার কেঁদে উঠলেন নীলিমা।

কিন্তু, পরদিন থেকে আশ্চর্য কঠোর হয়ে গেলেন নীলিমা। গৃহকর্মের তত্ত্বাবধান যেমন করে যান, তেমনি করে যেতে লাগলেন যথারীতি কিন্তু কী যেন এক কঠিনতার ডোরে যে বেঁধে রেখেছেন নিজেকে, একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। বাড়ির আয়া-বেয়ারারাও মেমসাহেবকে ভয় করে চলে বোধহয় সাহেবের থেকেও বেশী। তারা কিছু জানলেও মুখ ফুটে সাহেব বা মেমসাহেবকে বলবার স্পর্ধা রাখে না। এক খোকাবাবু, অর্থাৎ গৌতম। কিন্তু সে-ও নিজেকে এমন এক গণ্ডীর মধ্যে রেখেছে নিজের পড়াশুনার আড়াল দিয়ে যে, তার ভিতরে অনুপ্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। প্রায়-বৃদ্ধা

আয়াটির অনুসন্ধিৎসা ওরই মধ্যে একটু বেশী। সে হয়ত সাহস করে এক-একদিন এগিয়ে যায় খোকাবাবুর কাছে, চা কিম্বা জলখাবার এগিয়ে দেবার প্রাক্কালে বলে—খোকাবাবু ?

লগারিথম্-এর সাহায্যে কী এক দুরূহ অঙ্কের ফলাফলে পৌঁছবার অধ্যবসায়ে হয়ত গৌতম তখন ব্যস্ত, সে মুখ না তুলেই বললে—কী ?

আয়া বললে—দিদিমনি কোথায় গেছে খোকাবাবু ?

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল গৌতম, তারপরে অসীম বিরক্তিতে মুখবিকৃত করে সে বলে ওঠে—তা দিয়ে তোর দরকার কী ! আপদ কোথাকার ! যা এখান থেকে !

আয়া তাড়াতাড়ি সরে আসে।

বেয়ারাও ওর অনাবশ্যক কৌতূহল দেখে রাগ করে। বলে—সাহেবের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিস, মুখ বুজে কাজ করে যা। কোথায় কী হল, কে কী করলে, এসব দেখবার বা বুঝবার কথা আমাদের নয়। কিছু দেখলেও বা বুঝলেও চুপ করে থাকতে হবে। এগিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে সাহেবদের কিছু বলতে গেলে, সাহেবরা চটে যান। এতদিন আছিস, কত সাহেবদের বাড়িতে কাজ করলি, এদের ধরণ-ধারণ এখনও শিখলি না ? আয়া চুপ করে যায়। কিন্তু মনটা তার ভালো নেই। গেল কোথায় দিদিমণি ? প্রথম-প্রথম না দেখে ভেবেছিল, সেই যে দিদিমণির এক জ্যেঠতুতো বোন আসত, তার কাছে গেছে হয়ত। কিন্তু পরে কথাবার্তায়, আভাষে-ইঙ্গিতে সে বুঝতে পারল, মা-বাবার সঙ্গে মনকষাকষি হয়েছে, তাই কাউকে কিছু না বলে কোথায় বুঝি চলে গেছে দিদিমণি ! আহা, বড় ভালো মানুষটি ছিল গো ! কী মিষ্টি ব্যবহার, কী মিষ্টি কথাবার্তা।

আবার একদিন সুমনার 'ন্যাস-কার'টা এসে লাগল বাড়ির দরজায়। গাড়ি থেকে নামল সুমনা, সঙ্গে অভিজিৎ আর অপর এক বর্ষিয়ান ভদ্রলোক। গৌতম তখন নীচের তলায় ছিল বলে ও-ই এগিয়ে গিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল সবার আগে।

সুমনা বললে—কাকু কোথায় ?

—ওপরে।

অভিজিৎ প্রশ্ন করল—কাকীমা ?

—ওপরে।

অভিজিৎ সুমনার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—আমরা কি ওপরে যাব ?

সুমনা বললে—আপনি যান। আমি ওঁকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসছি।

অভিজিৎ আর দ্বিধা না করে সরাসরি উঠে এল ওপরে। মুখার্জিকে সুমনাদের উপস্থিতির কথাটা বলেই মৃদু টোকা দিল নীলিমা দেবীর ঘরে।

—কে ?

—আমি অভিজিৎ। আসতে পারি ?

ঘরের ভিতর থেকে আগ্রহান্বিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—নিশ্চয়ই। এস এস।

অভিজিৎ দরজা ঠেলে নীলিমার ঘরের মধ্যে গেল। আর মুখার্জি নেমে এলেন নীচে, বসবার ঘরে। গৌতম ততক্ষণে বেয়ারাকে নিয়ে অতিথি-সৎকারে মনঃসংযোগ করেছে।

সুমনা উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে প্রণাম করে বললে—কাকু, ইনি মিস্টার সিদ্ধান্ত। ওঁকে একেবারে ধরে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে।

মিস্টার সিদ্ধান্ত ওঁকে করযোড়ে নমস্কার জানিয়ে সহাস্যে বলে উঠলেন—সুমনার সঙ্গে অভিজিতের মাধ্যমে হঠাৎ-ই একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। নইলে নিজেই আমি খুঁজে খুঁজে আসতাম, দেখা করতাম আপনার সঙ্গে।

—বসুন।

বসলেন ওঁরা।

সুমনা বললে—তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বল কাকু। আমি ওপরে কাকীমার কাছে গিয়ে বসি।

মুখা   একটু হেসে বললেন—সে কী রে! তুই ওঁকে নিয়ে এলি, আর তুই-ই—

সিদ্ধান্তর মুখেও ফুটে উঠল হাসির রেখা, বললেন—তা হোক। ওঁর মাধ্যম আর প্রয়োজন হবে না আপাতত।

সুমনাও একটু হাসল, বললে—তাহলে মনে কিছু করবেন না তো? আমি যাই?

—আসুন।

যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল সুমনা। সিদ্ধান্তর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—'আপনি'র বেড়াজালটা এতক্ষণে সরে যাওয়া উচিত ছিল। সোমা আমার দিদি। আর আপনি কাকুরই বয়সী।

হেসে উঠলেন সিদ্ধান্ত। তারপরে সস্নেহে বললেন—আচ্ছা, তাই হবে।

সুমনা চলে গেল।

ততক্ষণে সিদ্ধান্তকে ভাল করে লক্ষ্য করছিলেন মুখার্জি। সোমা একবার বলেছিল—অনেকটা আপনারই মত ওঁকে দেখতে বাবা! আপনারই বয়সী।

কিন্তু মুখার্জির মনে হল—সিদ্ধান্তর চেহারার মধ্যে যে অদ্ভুত সৌম্যতা আছে, শান্তশ্রী আছে, তা তাঁর মধ্যে নেই। হয়ত তাঁর নিজের মত অত লম্বা-চওড়া চেহারা নয়, বরং একটু ছোট-খাটো মানুষ বলেই মনে হয়। দেহের বর্ণ অবশ্য সুগৌর, আর যেখানে ওরা ওঁর সঙ্গে এঁর মিল খুঁজে পেয়েছে, সে হচ্ছে, মাথার চুল। এঁর মাথার ঘনসম্বদ্ধ কেশগুচ্ছও তাঁর নিজের মতই সম্পূর্ণ শুভ্র। তবে আরও বড় বড় এবং আরও কুঞ্চিত। পরণে সাদা ধুতির ওপরে একটা আলখাল্লার মত গেরুয়া রঙের ঢিলে-ঢালা লম্বা পাঞ্জাবী, কাঁধের ওপরে এণ্ডির চাদর। চোখে পুরু চশমা।

সিদ্ধান্ত প্রশ্ন করলেন—আমার কথা কি কখনও আপনি শুনেছেন সোমার কাছে?

মুখার্জি মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ।

তারপরে বলে উঠলেন—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের সঙ্গে আপনি সংশ্লিষ্ট, তাই না ?

সিদ্ধান্ত বললেন—ছিলাম। অবসর পেলাম, তাই দেশে ফিরে এসেছি

—তার মানে রিটায়ার্ করেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখন কলকাতাতেই থাকবেন ?

—আজ্ঞে তা একরকম বলতে পারেন। তবে বেশীদিন নয়। ইয়োরোপ ত দেখলাম, এবার সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা আছে।

ইতিমধ্যে গৌতমের ব্যবস্থাপনায় চা এসে উপস্থিত করল বেয়ারা।

মুখার্জি বললেন—আসুন চা খেতে খেতে কথা বলা যাক্।

তারপরে গৌতমের দিকে তাকিয়ে ওকে পরিচিত করতে যেতেই সিদ্ধান্ত বলে উঠলেন—আলাপ করিয়ে দিয়েছে সুমনা। সর্বপ্রথমে ওরই সঙ্গে ত আলাপ হল।

সামান্য একটু ভদ্রতা-সুলভ কথাবার্তার পরই গৌতম সরে গেল ওঁদের কাছ থেকে।

সিদ্ধান্ত বললেন—সোমার কথা সবই শুনলাম সুমনা এবং অভিজিতের কাছে। আমি ত জানি না সে কোথায় গেছে, কিন্তু তার জন্য কোনও ভাবনা করবেন না, কোনও অন্যায় কাজ সে করতে পারে না। সে শিক্ষাই তার নয়। তবে উদ্বেগ একটা হয় বইকি। এদেশে সে নতুন। বরং আমার উৎসাহেই সে এখানে চলে আসে, নইলে তার মায়ের যে খুব ইচ্ছা ছিল এমন নয়। তাই আমিও একটা নৈতিক দায়িত্ব এতে বোধ করছি। দেখি চেষ্টা করে তার সন্ধান আমি বার করতে পারবই, এ বিশ্বাস আমার আছে।

মুখার্জি বললেন—করুন। আমাকে সন্ধান করতে সে নিষেধ করে গেছে।

সিদ্ধান্ত বললেন—সুমনার কাছে সে কথাও শুনেছি। কিন্তু কী জানেন? সোমার খোঁজ-খবরটা আমারও নেওয়া কর্তব্য, কারণ আমি তার শিক্ষক ছিলাম বলতে পারেন। সেদিক দিয়ে আপনার কাছে আমার আসার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশী যে জন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন, সে হচ্ছে অন্য কারণ।

উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠলেন মুখার্জি—বলুন?

সিদ্ধান্ত একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন—আমি মিসেস মুখার্জির কথাই বলছি।

—আমার স্ত্রী!—একটু বিস্মিত হয়েই মুখার্জি বললেন—সে হয়ত এখুনি আসবে। সুমনা আর অভিজিৎ ত তারই কাছে—বাধা দিয়ে সিদ্ধান্ত বলে উঠলেন—না, না, আমি এঁর কথা বলছি না, আমি বলছি সোমার মায়ের কথা।

মুখার্জি স্তব্ধ হয়ে গেলেন মুহূর্তে। মনে হল মস্তিষ্কে আর কোনও যেন চিন্তার রেখা ফুটছে না, কণ্ঠে যেন আর কোন স্বরও উঠছে না ফুটে! ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ-ই নিস্তেজ, নিরুত্তাপ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে যেন অতিকষ্টে সামলে নিয়ে মুখার্জি প্রশ্ন করলেন—বলুন। কী বলতে চান?

সিদ্ধান্ত বললেন—জানেন বোধহয় ল্যাম্বেথে তিনি আছেন।

—শুনেছি।

—সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল করেছেন।

—তা-ও শুনেছি।

সিদ্ধান্ত বললেন—ইণ্ডিয়া হাউসে আমার সঙ্গে ওঁদের আলাপ হয়েছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মা ও মেয়ের আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছিল বেশী। আমি ওঁদের পড়াশুনায় যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। সেই সূত্রে যতটুকু লক্ষ্য করেছি, তা এই যে, মা ও মেয়ের আপনার ওপরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

একটু অস্বস্তি বোধ করেই মুখার্জি বলে উঠলেন - কিন্তু আপনার আসল বক্তব্যটাই বলুন, ভূমিকা না-ই বা করলেন? সোমা আমার মেয়ে, আপনারও স্নেহভাজন, আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের ভূমিকা তো সোমাই করে রেখেছে।

সিদ্ধান্ত একমুহূর্ত থেমে থেকে, তারপরে বললেন—মিসেস মুখার্জি কলকাতা আসতে চান। চিঠি পেয়েছি।

নিরুত্তর রইলেন মুখার্জি। স্তব্ধ এবং নিশ্চল। গ্লাসগোর দিনগুলি যেন হঠাৎ-ই উঁকি দিতে চায়। জর্জ স্কোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনকার সেই কথা, আমার সঙ্গে তোমাকে ভারতবর্ষে যেতেই হবে সুজাতা!

—না।

সেই 'না,' আজ সম্মতির ইঙ্গিতে নেমে এল কোন্ জাদুমন্ত্রে!

সিদ্ধান্ত বললেন—দেখুন, সোমা বা মিসেস্ মুখার্জি যে কথাটা আমার সম্বন্ধে একেবারেই জানেন না, সেটা হচ্ছে এই যে—আমি হিন্দুই নই। আমি হিন্দুধর্ম, গীতা-উপনিষদ নিয়ে ওদের কাছে খুবই ব্যাখ্যা করতাম, কারণ ওরা হিন্দুই হতে চাইত বলে। সোমা তো নিজেকে হিন্দুই বলত। মিসেস মুখার্জিও নিজেকে পরিচয় দেন হিন্দু বলে। আমি আসলে খ্রীষ্টান।

—খ্রীষ্টান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খ্রীষ্টান আমরা তিন পুরুষে। তাছাড়া বহুদিন থেকেই আমি একটু যাকে বলে, মিশনারী-ঘেঁসা। আমি ভারতে এসে মিশনেই আত্মনিয়োগ করেছি। সংসারে আমি একা লোক, বাকি জীবনটা মিশনারীর জীবনই যাপন করতে চাই।

মুখার্জি বললেন—একটু আশ্চর্য লাগছে। নিজে খ্রীষ্টান অথচ সোমা বা তার মাকে হিন্দুধর্মের অনুকূলে মনটা ঘুরিয়েছেন। এটা কেন? বিশেষ করে নিজে যখন মিশনারী, খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার নিশ্চয়ই আপনার করণীয়ের মধ্যে পড়ে। তখন—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—ওঁদের তৃষ্ণা ছিল হিন্দুধর্মে আর

দর্শনের দিকে। আমি ওঁদের ভাব নষ্ট করতে যাই কেন? তাই হিন্দুদর্শন নিজে পড়েছি, আর ওঁদের পড়িয়েছি। ঘুণাক্ষরেও জানতে দেই নি যে, আমি হিন্দু নই। কিন্তু দেখুন আসল সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে এখন। মিসেস মুখার্জি লিখেছেন, তিনি ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় শিশুদের পরিচর্যা করতে চান। লিজেল রেমর 'সিষ্টার নিবেদিতা' বইখানাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে আর কী। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁকে আর সাহায্য করা কেমন করে সম্ভব? এ বিষয়ে আপনি যদি—

মুখার্জি বললেন—আমি কতদূর কী করব? তাছাড়া, আমাকে তো সে—

সিদ্ধান্ত বললেন—বুঝেছি আপনি কী বলতে চান। দেখুন আমার মনে হয়, পাছে আপনার সংসারে কোন ঝড় ওঠে, তাই আপনাকে সে চিঠি লেখে না। কিন্তু আপনাকে যে উনি কতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা করেন—সে তো আমি লক্ষ্য করে এসেছি।

মুখার্জি বললেন—সে কী আমার এখানে এসে উঠতে চায়?

—না।—সিদ্ধান্ত বললেন—তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চান। আমি অবশ্য প্রাথমিক কাজটা করে দিতে পারি। কিন্তু সেসব কী ভাল হবে? তার থেকে যেমন ল্যাম্বেথে তিনি আছেন, তেমনিই থাকুন না। আপনি কী বলেন? আপনার কথা দিয়ে তাঁকে আসতে বারণ করে দেব?

মুখার্জি বললেন—আমার কোন মতামত নেই। তাকে আসতেও বলব না, আসতে বারণও করব না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সে কী সোমার নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদটা জানে?

—না। ভাবছি জানাব কী না? আপনি কী বলেন?

—এ বিষয়েও আমার কোন মতামত নেই, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন—আমার পক্ষে কিছু জানাবার থাকলে আমি নিজেই হয়ত জানাতাম। আপনি আসুন মিস্টার সিদ্ধান্ত,

একবার ওপরে দয়া করে চলুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করে আসবেন। শরীরটা তাঁর ভাল নেই, তাই—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, চলুন।

যথারীতি নীলিমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল সিদ্ধান্তের। দু চারটে কথার পরই বিদায় সম্ভাষণের পালা এল। উঠে দাঁড়ান অভিজিৎ। সুমনাও উঠল। মুখার্জি বললেন—তুই থাক্ না? তুই উঠছিস কেন?

সুমনা বললে—কাজিরাঙ্গা থেকে ফিরে আসবার পর ভীষণ সুটিং চলছে যে! দুপুরবেলা ভালোমন্দ খাবার পাঠানো চাই। তা না হলে বাবুর খুব রাগ হবে যে!

—খুব খুশীতে আছিস বল?

সুমনা বললে—দিদিটা নেই, কাকে আর সে সব গল্প করব বল!

সোমার উল্লেখে মুহূর্তে যেন কালো একটা ছায়া ঘনিয়ে এল আসরের মধ্যে। অভিজিৎ বললে—গৌতমটা লুকাল গিয়ে কোন্ কোটরে?

নীলিমা বললে—মিস্টার সিদ্ধান্তর নাম কিন্তু আমি সোমার মুখে শুনেছি মনে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত বললেন—শোনাটা স্বাভাবিক। ওর মাকে যে আমি বাংলা শিখিয়েছিলাম।

নীলিমা একটু চমকে মুখ ফেরালেন ওঁর দিকে, বললেন—চেনেন ওঁর মাকে?

—তা চিনি বই কী। চমৎকার মহিলা।—সরল-প্রাণ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিটা তলিয়ে না বুঝে মনের আবেগে বলে গেলেন—কলকাতায় হয়ত সে আসবে শীগগিরই। আলাপ করে খুবই ভাল লাগবে আপনার তাঁকে!

মুখখানা কঠিন, কঠোর হয়ে গেল মুহূর্তে নীলিমার, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—ও।

কিন্তু তাঁর সমস্ত আবেগ ফেটে পড়ল স্বামীর কাছে, ওঁরা সবাই

চলে যাবার পরে। চাপা উত্তেজনায় পাণ্ডুর মুখখানা একটু লাল হয়ে উঠেছে। বললে—তাই বল, তবে আসছে ?

—আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

নীলিমা বললে—জানলেও ভাঙবে না কিছু। আচ্ছা, আসুকই সে। আমি তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, এতবড় অত্যাচার করবার কী অধিকার তার আছে ?

—অত্যাচার !

—নয় !—নীলিমা বলতে লাগল—খবর নিয়ে দেখ, মেয়েটাকে নিজেই চিঠি লিখে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে ! এরপরে এসে মা আর মেয়েতে একত্রে থাকবে। তারপরে যাবে তুমি। আমি গৌতমকে নিয়ে পড়ে থাকব একা।

—এসব কী বলছ তুমি !

—ঠিকই বলছি ! তোমাদের চিনি না ! মিলি চলে যাবার পিছনে তোমারই বা কোন হাত আছে কিনা কে জানে ? চীৎকার করে উঠলেন মুখার্জি—নীলিমা !

নীলিমা উত্তেজনার মুখে কী বলে বসত কে জানে, হঠাৎ নীচে থেকে দ্রুতপায়ে ছুটে এল গৌতম। বললে—টেলিগ্রাম এসেছে।

—টেলিগ্রাম !

—হ্যাঁ, আমি খুলেছি। পড়ব ? জ্যেঠামশায় করেছেন।

—জ্যেঠামশাই ! মানে—

গৌতম বললে—হ্যাঁ, বড়-জ্যেঠামশাই। গিরিডি থেকে।

বলেই টেলিগ্রামটা পড়তে লাগল গৌতম। সে পড়ছে, আর মুখার্জির মনে হতে লাগল—বড়দা কখনও কোন চিঠি দেন না। দেন টেলিগ্রাম। সেই গৌতম জন্মাবার খবর পেয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন—'সুধীর, তোর ছেলের নাম রাখলাম গৌতম।'

এবারেও সেই তারবার্তা। 'সোমা বিয়ে করেছে আমারই এক স্নেহভাজন ছাত্রের ভাইকে। নাম, অনুপম। শীগগিরই ওরা চলে

যাবে অনুপমের কর্মক্ষেত্রে, পাটনায়। আগামী সন্ধ্যায় প্রীতিভোজ। তোমরা এস।'

এ যেন অজ্ঞাত এক বিশ্বের খবর! বিশ্বের যত কিছু সুসংবাদ, তার সঙ্গে বড়দার যেন অদ্ভুত এক যোগসূত্র থাকে। যাবেন নাকি এখুনি ছুটে মুখার্জি বড়দার কাছে?

আনন্দের এক অদ্ভুত স্রোত অনুভব করলেন মুখার্জি। বলে উঠলেন—গৌতম ওরা বোধহয়—বলেই থেমে অন্যকথা তুললেন—সুমনার বাড়ি তুই চিনিস্? অভিজিতের বাড়ি? মিস্টার সিদ্ধান্ত বোধহয় অভিজিতের বাড়িতেই উঠেছেন। খবর দিয়ে আয়, আজ বিকেল কি সন্ধ্যার কোন ট্রেনেই—।

বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলেন তিনি, তারপরে নীলিমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন—তুমি কি বল নেলী?

নীলিমা কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

একটুক্ষণ বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? তুই যা। ছোট্। ট্যাক্সি নে একটা। যাবার পথে যেন বরং ওরাই আমাদের তুলে নেন। ট্রেনের সময়-টময় ওদের সঙ্গে বসে তুই-ই ঠিক করে আসবি।

—আচ্ছা। বলে, গৌতম ছুটে চলে গেল। উনিও দ্রুতপায়ে গেলেন নীলিমার ঘরে।

—নেলী?

জানলার কাছে চেয়ার টেনে নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত বসে আছে নীলিমা।

মুখার্জি বললেন—এখন থেকে গোছগাছ করতে হয়, কী বল? কিছু মার্কেটিংও করা দরকার।

নেলী বললেন—আমি যাব না।

—কেন!

উঠে দাঁড়ালেন নীলিমা, বললেন—তুমি যেতে চাও, যাও।

কিন্তু আমি যাব না। বিয়ে! আমরা দেখলাম না শুনলাম না,—বিয়ে! কে এই অনুপম?

—জানি না তো।

আয়াটা ঠিক ওই সময় কী কাজে যেন সন্তর্পণে এখান দিয়ে যাচ্ছিল, তার কানে হঠাৎ-ই গেল কথাটা। দিদিমণি কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে, এ খবরটা সে শুনেছে, কিন্তু ঠিক কাকে বিয়ে করেছে, সেটা জানা ছিল না। এবার 'অনুপম' নামটা কানে যেতে একটু সতর্ক হয়ে দাঁড়াল আয়া, তারপরে পাছে মেমসাহেব বকে উঠেন সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল ওখান থেকে।

কিন্তু কে এই অনুপম? নামটা তো শোনা শোনা লাগছে! ভাবতে ভাবতে আয়ার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ ধ্বক্ করে উঠল। দিদিমণি পাশের ওই পুরাণো একতলা বাড়ির বউটির কাছে মাঝে মাঝে গল্প করতে যেত। আয়াও যেত আগে আগে অবসর মত। বেশ কিছুদিন যাওয়া হয় না। ওই বাড়ির বউটির দেওরের নাম যেন অনুপম ছিল না? মনে হওয়া মাত্রই হাতের কাজ ফেলে আয়া ছুটল ওদের বাড়ির দিকে। কিন্তু ওদের বাড়িতে, কোথায় কে? বাড়ির দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরেই আসছিল আয়া, হঠাৎ সামনের ছোট্ট দোকানটার মুদী তাকে ডেকে কী বলছে বুঝতে পেরে সে ওর দিকে এগিয়ে গেল। ওদের দরজাটা তো ছোট্ট গলির ওপরে—তার সামনেই টিনের বস্তি-মতন। সেই বস্তিরই ছোট্ট একটা ঘরে কিছু চাল, ডাল, হলুদ, লঙ্কা, দেশলাইয়ের বাক্স, কাপড়কাচা সাবান—এইসব সাজিয়ে বসে থাকে মধ্যবয়সী মুদীটি। সে ডেকে বললে—কাকে খুঁজছ? বাবুরা গিরিডি চলে গেছে। আমাকে বলে গেছে চিঠিপত্র এলে পিওনের কাছ থেকে নিয়ে রাখতে

—কোথায় গেছে বললে?

—গিরিডি। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে।

—বিয়ে!

—হ্যাঁ গো।

—কার সঙ্গে?

—তা আমি কী করে জানব। আমাকে বড়বাবু বললে—অনুপমের বিয়ে। তাই গিরিডি যাচ্ছি, তুমি সব দেখাশুনো কর। বাড়ির চাবিও আমার কাছে।

—কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তা তুমি জান না?

—না।

—ওঁরা কবে গেলেন!

—এই ত পরশু। বড়বাবু বললেন—অনুপম চিঠি দিয়েছে আমাদের যেতে। তাই যাচ্ছি। ওর বিয়ে। বুঝলে মন?

—ছোট ভাইয়ের নাম বুঝি অনুপম।

মধু-মুদী বললে—হ্যাঁ।

আয়া আর কোন কথা না বলে চলে এল বাড়িতে। চুপি চুপি একেবারে মেমসাহেবের কাছে। মেমসাহেব খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তার আসন থেকে। মুখার্জি তখন ছিলেন নিজের ঘরে, কী-সব শেয়ারের কাগজ-টাগজ টেবিলে ছড়িয়ে নিয়ে কী-যেন হিসাব করছিলেন। নিলীমা সে ঘরে এসে বললেন—এই শোন তোমার মেয়ের সব কাণ্ড।

সবিস্ময়ে চোখ তুললেন মুখার্জি—কী শুনব!

নীলিমা আয়ার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও।

আয়া তো ততক্ষণ সত্যিই চলে যেতে পারলে বাঁচে!

সে চলে যেতেই নীলিমা ওঁকে বলতে আরম্ভ করলেন সব কথা। বস্তিতে বাস-করা সামান্য একটা ছেলে, ওই পাশেই থাকত ওরা, লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের বাড়ি যেত মেয়ে, কাক-কোকিল কেউ টের পেত না!

শুনতে শুনতে কিন্তু হঠাৎ-ই এক স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল মন। নীলিমার কথায় বুঝলেন, ছেলেটি গরীব। কিন্তু সোমা কী ভুল করবার মেয়ে? এমন ছেলেটিকে বরণ করে সে যেন দেখতে পেয়ে থাকে

সত্যিকার ভারতবর্ষের আত্মাকে! "সুখেষু বিগতস্পৃহ দুঃখেষু অনুদ্বিগমনাঃ" কাউকে কী দেখতে পেয়েছে সে? খুবই জানতে ইচ্ছা করে।

নীলিমা ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, ভাবছ কী অত?

ঈষৎ চমকে উঠেই মুখার্জি বললেন, না, কিছু না।

নেলী ওঁর কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে বলে উঠলেন, শেষ পর্যন্ত বস্তির একটা ছেলেকে বিয়ে! ছিঃ-ছিঃ!

স্তব্ধ হয়ে রইলেন মুখার্জি!

নেলী বললেন, দেখলে তো কী অকৃতজ্ঞ মেয়েটা! ওর মুখ-দর্শন করব না আমি!

—ঠিক বলেছ! মুখার্জি ধীর কণ্ঠে বললেন, ওর মুখদর্শন করাও উচিত নয়।

পরের দিন, সকাল বেলা। গিরিডির একপ্রান্ত। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। পাশাপাশি দুটো বাড়ি, অনেকটা একই ধরণের। মুখার্জির যিনি বড়দা, দুটো বাড়িই তাঁর। একটিতে তিনি নিজে থাকেন স্বামী-স্ত্রীতে, অন্যটি অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য রাখা। এই অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটার কথাই এখন বলছি। একটা ঘরে, টেবিল টেনে দরজার কাছে নিয়ে এসে তার ওপরে দাঁড়িয়ে, ফুলের মালা টাঙাতে ব্যস্ত রয়েছে অনুপম। প্রতিটি দরজা আর জানলার মাথায় দেওয়াল-ঘেঁসে মালা সাজানোর ইচ্ছাটা হয়েছে তারই। পরণে তার ধবধবে সাদা নতুন ধুতি আর গেঞ্জি। এক কাপ চা আর প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে ঘরে এলেন বউদি। সেই বউদি, অভ্রজ্যোতি আর অর্ঘকুসুমের মা।

বউদি ওর দিকে তাকাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, ও কী করছ?

—সাজাচ্ছি, দেখছ না? লোকজন আসবে—

—আহা, ভারী তো লোকজন!—বউদি বললে, সোমার জ্যাঠা-

মশাই, আর জ্যাঠাইমা, আর আমরা। আর পুরুতমশাইকে নিয়ে জন চারেক লোক। এক কলকতা থেকে যদি সোমার বাপ-মা আর ভাই আসেন!

—আসবেনই!—বলে, টেবিল থেকে নেমে নীচে দাঁড়াল অনুপম, তারপরে টেবিলটাকে টেনে যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললে, ঝগড়া করার প্রবৃত্তি মানুষের সহজে যায় না। আমাকে দশ কথা তাঁদের না শোনাতে পারলে চলবে কেন!

—আহা! বউদি হাতের চা আর প্লেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, তোমার দোষ কী! তুমি তো গিরিডিতে এসে পালিয়ে বসে ছিলে। সোমাই তো নিজে ছুটে এল।

অনুপম মুখ নীচু করল, কিছু বলল না।

বউদির পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর এবার স্নেহে গভীর শোনাল, বললেন, না এসে পারে! কী কষ্টই না পেয়েছে মনে-মনে! বলেই, সুর বদল করে, কই চা খাও?

—খাচ্ছি।

—তোমার ভাইপোরা কোথায়? তোমার দাদাই বা কোথায়?

মুখ তুলে অনুপম বললে, ও বাড়ি। জ্যাঠামশায়ের কাছে।

বউদি বললেন, তার মানে নিজের অধ্যাপকের কাছে ছাত্র গিয়ে শাস্ত্রালোচনা করছেন আর কী!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর আবার বললেন, তা করুন। কিন্তু ওঁর অধ্যাপকও কী অসাধারণ মানুষ! কী সৌম্য, শান্ত চেহারা। সোমাকে সম্প্রদান তো উনিই করলেন। একটুও দ্বিধা করলেন না। বললেন, সুধীর তো তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না। তোমরা জানবে, যা করছি, অন্ততঃ ওর আন্তরিক অভিলাষ মতই করছি।

অনুপম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললে, বস বউদি।

বউদির ভঙ্গীতে এল চাঞ্চল্য, বললেন, না, আমি যাই, অনেক

কাজ। আজ তোমার ফুলশয্যাও বটে, বিয়ের প্রীতিভোজও বটে! বউদি ত্বরিত প্যায়ে চলে গেলেন এবং তার কয়েক মুহূর্ত পরে দরজার কাছে লঘু পদধ্বনি শুনে উৎকীর্ণ হয়ে উঠল অনুপম। ধীর পায়ে, সলজ্জ ভঙ্গিমায় কাছে এসে দাঁড়াল সোমা। পরণে গোলাপী একটা শাড়ি আর লাল ব্লাউজ, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় নেকলেস, হাতে চুড়ি-বালার মধ্যে শুভ্র শাঁখা আর লোহাও বিরাজ করছে। যাকে বলে একেবারে সালঙ্কারা কন্যা।

—কী?

সোমা ওর কাছে এসে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে তাকাল ওর দিকে মুখ তুলে। অবগুণ্ঠনবতী সোমাকে দেখাচ্ছে অপরূপ!

সোমা মৃদুকণ্ঠে বললে, আজকেই তো মা-বাবা-গৌতম আসবেন মনে হয়, তাই না?

—নিশ্চয়ই।

অনুপম চকিতে একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিয়ে, ওর আরও কাছে সরে এসে ওর একখানা হাত টেনে নিল হাতের মধ্যে। তারপরে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, বাবার জন্য মন কেমন করছে খুব, না?

সোমার চোখ দুটো ওমনি ভরে উঠল জলে, সে মুখ নীচু করল, তারপরে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু, সকালের গাড়ি এল আর চলে গেল। বাবা-মা এলেন না, এল না গৌতম। যিনি অকস্মাৎ এসে সোমার সামনে দাঁড়ালেন, তিনি মিস্টার সিদ্ধান্ত। বললেন, তোমার বাবাই তো তাঁর ছেলেকে দিয়ে আমাদের খবর পাঠালেন। সুমনাও আসত, কিন্তু ওর স্বামী হঠাৎ কাল এল সুটিং সেরে আসামের জঙ্গল থেকে! খুব ক্লান্ত হয়ে, একটু বুঝি অসুস্থও। তাই সে আসতে পারল না। কিন্তু তোমার মা-বাপ-ভাই কেন এল না জানি না। হাওড়া স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবার সাক্ষাৎ করবার কথা। তোমার ভাই

শুধু এল, হাতে তার চিঠি। তোমার বাবাই লিখেছেন আমাকে। অনিবার্য কারণ বশতঃ তিনি যেতে পারছেন না, সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। চিঠিটা পড়ে আমি গৌতমকেও জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যাবে না? সে-ও উত্তর দিল, না। আমার মা যেখানে যেতে পারবেন না, সেখানে আমিও পারব না যেতে।

সোমা মুখ নীচু করে সমস্তই শুনে গেল ধীর মনে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলল সে। আসা মাত্রই চোখে পড়েছিল, তবু এবার যেন আরও স্পষ্ট, আর উজ্জ্বল দেখাল ওঁর গলা থেকে ঝুলানো ক্রশটা। গলায় ওঁর ক্রশ, পরণেও খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মত লম্বা সাদা আলখাল্লা। সোমা প্রশ্ন করল, আপনার এ বেশ কেন কাকাবাবু?

সিদ্ধান্ত একটু হাসলেন, বললেন, এ বেশটাই আমার স্বাভাবিক। আমি মিশনারী এবং তোমাদের কোনদিন জানাবার অবকাশ পাই নি।

—কিন্তু—

—এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই। আমি গীতা-উপনিষদ পড়েছি, তার সঙ্গে বাইবেলের কোন বিরোধ আছে বলে আমি মনে করি না। আমি তিন পুরুষে খৃষ্টান, তাই ওই ধর্মটাই বজায় রেখেছি। অবশ্য এসবও কিছু নয়, পরমহংসদেবের "যত মত তত পথ"ই বড় কথা।

সোমার জ্যেঠামশাই খবর শুনে এলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, আসতে পারবে না, এটা আমিও জানতাম মনে মনে। কী জানেন? ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা ওর উপর সেই ছোট থেকেই সব-কিছু চাপিয়ে দিয়েছি। অম্লান মুখে সব ভার বয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই, ওর নিজের ইচ্ছাকে ও শামুকের মত গোপন করে রেখে, পরের ইচ্ছাতেই ওর বাইরের চলাফেরা।

যাবার আগে সোমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে সিদ্ধান্ত বললেন, তোমার মা আসছেন ইণ্ডিয়ায়।

—মা!

—হ্যাঁ।

অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল অকস্মাৎ সোমার দেহ-মন। বললে, কাকাবাবু! কোথায় উঠবে মা?

—এক শিশু-বিদ্যালয়কে আশ্রয় করে। আমি মোটামুটি ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দিদির সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি মিশনের কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।

সোমার মনে পড়ল, কখনও-কখনও কাকাবাবু মাকে দিদি বলে ডাকতেন লণ্ডনে। সোমা বলত, আপনি মাকে দিদি বলে ডাকলে আমায় আপনাকে মামাবাবু বলে ডাকতে হয়। আমার কিন্তু কাকাবাবু বলে ডাকতে ভালো লাগে, আপনি মাকে বৌদি বলে ডাকুন না?

—বৌদি?

ডাক শুনে মা-ও যেন খুশী হয়ে উঠত ভিতরে ভিতরে।

এদিকে কলকাতায় প্রতিদিন যথা নিয়মে সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। দিন আসে, দিন যায়। বছর যায়। বছর ঘুরে আসে। তা-ও কেটে যায়। আরও বিশীর্ণ—আরও রুগ্ন দেখায় নীলিমাকে। মেজাজও ভয়ানক খিট্‌খিটে। দোতলার বারান্দায় বসে এক মনে কী বলেন, আর মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখেন মুখার্জি কী করছেন। হয়ত উনি গেছেন নীচে, লনে একটু বেড়াচ্ছেন। অমনি গৌতমকে লক্ষ্য করে নীলিমা ব'লে ওঠেন, দেখ ত, বাইরে বেরোয় কি না?

পাশের বাড়ি মিস্টার সিনহার বাড়িতে বেড়াতে গেলেও ওই এক প্রশ্ন, এখনও ফিরছে না কেন? ওখান থেকে কোথাও গেল না ত?

গৌতম হয়ত বা এক একদিন বলে বসে, গেলেনই বা, হয়েছে কী?

—হয়েছে কী! চীৎকার করে ওঠেন নীলিমা, তুই আমার ছেলে হয়েও এ কথা বলবি! শুনলি না সেদিন অভিজিৎ এসে কী বলে গেল?

গৌতম বড় হয়েছে, সুতরাং বুঝতে পারে সব। সে মাকে এসে জড়িয়ে ধরে বলে, ওসব কথা আমাকে বল কেন, মা? ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন নীলিমা, বলেন, কাকে আর বলব রে, কে আছে? মিলিটা চলে গেল। যাকে মিলি বলে বুকে পেলুম, সে-ও বুক ভেঙে দিয়েছে! এর পর যদি শুনি সেই মেম সাহেবটি বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছে, তাহলে মাথা স্থির রাখি কেমন করে বল?

সোজা হয়ে দাঁড়ায় গৌতম, বলে, তাঁর ঠিকানা জান?

—না, নীলিমা বলে ওঠেন, অভিজিৎ জানালো না, বললে, বারণ আছে। তাঁর ঠিকানা কাউকে সে জানাতে পারবে না।

—বাবা জানেন?

—সেইখানেই ত ভয়! কে জানে, অভিজিৎ তাকে ঠিকানা বলেছে কি না!

—আমি অভিজিতদাকে জিজ্ঞাসা করব?

—তোকে সে বলবে না।

গৌতম চুপ করে যায়। কিন্তু, মুখার্জিও বড় একটা বাইরে যান না। ব্যাঙ্কে লোক পাঠান। বিশেষ দরকার পড়লে সিনহাকে বলেন, নিজে পারতপক্ষে বাইরে যেতে চান না। বলেন, নেলীকে দেখবে কে? ওর শরীর ভাল নয়, ওর কাছে সর্বক্ষণ কারুর না কারুর থাকা দরকার। ডাক্তার আর কতদূর কী করবে? তাই আমিই থাকি কাছে কাছে।

এমনই এক দিনে এল হঠাৎ এক টেলিগ্রাম। সেই গিরিডি, বড়দার কাছ থেকেই। লিখছেন, পাটনায় সোমার একটা মেয়ে হয়েছে খবর পেলাম। ভাল আছে।'

—মেয়ে!

নীলিমা শুনে সোজা হয়ে বসে এবারেও বললেন শুধু একটি কথা,

—অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সারা দেহটা হঠাৎ হয়ে গেল

শক্ত, মুখখানা বিবর্ণ, আর দেখতে দেখতে মাথাটা ঘুরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন মুখার্জি, উনি জ্ঞান হারিয়েছেন।

এল গৌতম, ছুটে এল আয়া-বেয়ারা, খবর পেয়ে একটু পরে পাশের বাড়ি থেকে এলেন সিনহা আর মালবিকা। এলেন ডাক্তার। চিকিৎসা চলতে লাগল। কী এক দুরন্ত স্নায়বিক রোগ। শোচনীয় শারীরিক দুর্বলতা তার সঙ্গে মেশানো। জ্ঞান অবশ্য ধীরে ধীরে ফিরে এল, কিন্তু তারপরে যা ঘটল, তা মারাত্মক। যাকে বলে মস্তিষ্ক-বিকৃতি তা-ই ঘটল। তার পেয়ে দিল্লী থেকে এসে পড়লেন মিসেস বাতাসারিয়া, নীলিমার ভাইয়েরা। সুমনাও এল, সুমনার স্বামীও এল। মেজদা মেজবৌদি ত এলেনই। কিন্তু কিছুই হবার নয়, রীতিমত 'ভায়োলেণ্ট' হয়ে উঠতে লাগলেন মাঝে মাঝে।

সুমনা বুঝি গোপনে চিঠি লিখেছিল সোমাকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় সব সংবাদ জানিয়ে। একটি খাম এল মুখার্জির নামে। খামের মধ্যে ছোট চিঠি। কুশল প্রশ্ন ও প্রণাম জানিয়ে মাত্র একটি লাইন, বাবা, আমি কি যাব ?

চিঠিটা দেখানো হয় নি নীলিমাকে। মুখার্জি তাকে এক সময় শান্ত লক্ষ্য করে বলে উঠেছিলেন, সোমাকে আসতে লিখব ?

মুহূর্তে আবার অশান্ত হয়ে উঠলেন নীলিমা, খবরদার! ওর নামও করবে না!

মুখার্জি উত্তরে লিখে দিলেন ছোট্ট চিঠি, তোমাকে আসতে হবে না মা।

লিখতে গিয়ে হাতটা কী কেঁপে ছিল! কে জানে।

চিকিৎসকের চেষ্টায় অনেকটা আবেগ প্রশমিত হল বটে নীলিমার। চুপচাপই থাকেন, কিন্তু, সকালের দিকে, কখনও বা সন্ধ্যা হবো-হবোর মুখে হঠাৎ কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার করতে থাকেন! মুখে ফেনা উঠে যায়!

মিসেস বাতাসারিয়া এসে দাঁড়ালেন জামাইয়ের কাছে, বললেন, আমাকে ত যেতে হয়, সাজানো সংসার ফেলে এসেছি।

—আসুন মা।

বাতাসারিয়া বললেন, কিন্তু গৌতমকে এভাবে ফেলে রাখলে চলবে না। ও ভালভাবেই পাশ-টাশ করেছে, ওর বিলেতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবার কথা। ওকে পাঠিয়ে দাও, পড়াটা শেষ করে আসুক।

—বেশ। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গৌতম কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল। সে বললে, আমি গেলে মাকে দেখবে কে?

মুখার্জি বললেন, আমিই ত আছি।

গৌতম বলতে গেল, কিন্তু—

মুখার্জি ওর মুখের দিকে তাকালেন শুধু। তারপর বললেন, কিন্তুর কিছু নেই। এ আমারই কাজ।

গৌতমের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, বললে, আমার মাকে বুঝবে কে? কত মনোকষ্টে যে মা—

মুখার্জি উঠে এসে ওর কাঁধের ওপর হাতখানা রাখলেন, বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা তোমার মাকে নিয়েই ত আছি। তোমার মাকে কখনও অবহেলা করেছি, একথা বলতে পার?

গৌতম কোন কথা না বলে চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাতাসারিয়া চলে গেলেন। চলে গেলেন একে একে সবাই। গৌতম সবার যাওয়া দেখল চোখ মেলে, তারপরে একসময় এসে দাঁড়াল বাবার কাছে। বললে—আমি বিলেতেই যাব বাবা। পাঠিয়ে দিন।

মুখার্জি বললেন—বেশ।

অতএব কিছুদিনের মধ্যেই বিলেতের উদ্দেশে বোম্বাইয়ের পথে পাড়ি দিল গৌতম। যাবার সময় মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই নীলিমা বললেন—কী রে? প্রণাম কেন রে?

—বিলেত যাচ্ছি।

কয়েকমুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীলিমা, তারপরে আশ্চর্য ধীরকণ্ঠে বললেন—সেই মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে উঁ?

—না। মুখার্জি বললেন—ও যাচ্ছে পড়তে।

—পড়তে? নীলিমা বললেন—তবে যা। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাস্।

বলে, যেমন হাতে করে কী যেন বুনছিলেন, সেটাই বুনতে লাগলেন।

ওঁর কাছ থেকে সরে এল গৌতম। স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার পূর্ব-মুহূর্তে বাবাকে বললে—মাকে একমুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করবেন না বাবা!

—না রে, ও ছাড়া আমার কাছে আর কে রইল বল?

গৌতম বললে—বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বড়মার ঠিকানা কী?

একটু যেন চমকেই উঠলেন মুখার্জি, তারপরে বললেন—জানি না।

—দিদির ঠিকানা?

—জানি না।

জানেন না, কিছুই জানেন না তিনি ওদের! কী এক নিগূঢ় অভিমানে যেন ভরে উঠল অন্তর। সোমার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও তিনি তা বলতে পারলেন না গৌতম। ওকে শুধু বললেন—চিঠি যা লেখবার, আমাকে আর তোমার মাকেই লিখ। আর পড়াশুনা কোর মন দিয়ে।

গৌতমের ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঘরে ফিরে এলেন মুখার্জি। নার্স আছে, ডাক্তার আসে-যায় দু বেলা। তবু মনে হয়, মানুষ নয় এক প্রেতিনীর সঙ্গে যেন প্রতিনিয়ত বাস করে চলেছেন মুখার্জি। সিনহা একদিন চুপি চুপি বললে—মিসেস মুখার্জিকে স্যানিটোরিয়ামে পাঠালে কেমন হয়?

মুখার্জি যেন অমনি আর্তনাদ করে উঠলেন—না—না!

আশ্চর্য মানুষের মন। নীলিমাকে আজ বড় অসহায় মনে হয়। যার ওপর সংসারে এতকাল তিনি নিজে নির্ভর করে এসেছেন, সে আজ নির্ভর করছে তার ওপর—এ এক অদ্ভুত আস্বাদ তাঁর জীবনে! তাঁর মনে হল, ওকে ছেড়ে মুহূর্তের জন্যও তিনি থাকতে পারবেন না।

অথচ প্রতিদিন সকালে-বিকেলে শুনতে হবে ওর চীৎকার। প্রতিটি দিন ওর মুখে শত অভিসম্পাত না শুনলে যেন তৃপ্তি হয় না মুখার্জির। রাগ হয় না শুনে। মনে হয়, ও যত অভিযোগের কশাঘাত হানছে তাকে, ততই শান্ত হচ্ছে মন, তত ভিতরে-ভিতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অপরাধ-বোধের গ্লানি! সত্যিই ত, সারাটি জীবন একজনের স্বপ্ন মনে-মনে পোষণ করে কাটালেন, নীলিমাকে কী দিয়েছেন তিনি? নারীর যা কাম্য অন্তরের ভালবাসা, তা কি উনি দিতে পেরেছেন ওকে? দেন নি। দেন নি বলেই ভাগ্যের এই প্রহার মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। নিয়ে, ক্রমশঃ স্বস্তিই পাচ্ছেন। নীলিমা যত বলেন—সব মিথ্যে সব মিথ্যে—ওই আমার স্বামী—আমার ডাকাত—আমাকে সারা জীবন ঠকিয়েছে! ও মরুক! ও মরুক! ও মরবে কবে! আমি চেয়ে চেয়ে দেখব!

তত অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে আসতে চায় মন।

সিনহা বলে—এমনিতে ত বেশ চুপচাপ থাকেন। এই যে সকাল-বিকেল চীৎকার, এটাই যদি কমত, তাহলে—

বাধা দিয়ে বলে ওঠেন মুখার্জি—চীৎকার ত ও জোরে করে না! প্রতিবেশীর কোন শান্তির বিঘ্ন করে কী ও?

অপ্রতিভ হয়ে সিনহা বলে—না-না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি তোমার কথা।

—আমার কথা!—মুখার্জি বললেন—আজ আর আমার কথা কিছু নেই।

বলেই ইজি চেয়ারটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটি বোজেন। মনে-মনে বলেন—তোর মেয়েটি কেমন হয়েছে রে সোমা! আবার

সঙ্গে সঙ্গেই চমকে চোখ মেলে চারিদিকে তাকান। পাশে সিনহা, কিম্বা নীলিমা নেই ত? মনে-মনে কথা-বলার ধ্বনিটুকুও যদি শুনতে পায় নীলিমা!—না-না, ভাববেন না ওদের কথা, মুহূর্তের জন্যও ভাববেন না!

সিনহা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর বলে ওঠে—এরকম করে থাকলে মরে যাবে যে তুমি! নিজের চেহারার দিকে তাকিয়েছ কখনও!

ম্লান হাসেন মুখার্জি, বলেন—না, ভাই, মরব না।

সিনহা বললে—একটা কথা তাহলে বলি। মিসেসকে রাঁচী পাঠিয়ে দাও।

মুখার্জি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—না।

সিনহা আর কিছু বলে না। কেউ কিছু বলেন না। এ বাড়িতে যেন সব বলাবলির পালা শেষ হয়ে গেছে। সবাই যন্ত্রের মত ঘোরে, যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। দিনও যায় এ-ভাবে। দিন যায়, দিন আসে। গৌতম বিলেত পৌঁছে চিঠি দেয়। সেই চিঠি নীলিমাকে পড়ে শোনান তিনি, কিন্তু নীলিমা নিশ্চুপে করে চলেন তার হাতের কাজ। কোন কথাই বলে না। ভাব দেখে মনে হয়, গৌতম-সম্বন্ধে তার যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। গৌতম যেন তার জীবনলিপি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে!

গৌতমের চিঠির অংশ—'মা নিশ্চয়ই আমার কথা বলে। মাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন। আমি নেই, মার যেন কষ্ট না হয়! মা আমার জন্য কাঁদবে, আমি জানি। আপনি দেখবেন।'

কিন্তু কোথায় ওর কান্না! দেখে-দেখে মনে হয়, তিনিও চলে গেলে বোধ হয় তাঁর নামও অমনি করে বুঝি মুছে যাবে নীলিমার মন থেকে।

ও কথা ভেবে মনটা ভরে ওঠে অদ্ভুত করুণায়। কাছে বসে জিজ্ঞাসা করেন নীলিমাকে—ওটা কী বুনছ নেলী?

—সোয়েটার।

—দেখি ?

ওঁর হাতের দিকে জিনিষটা এগিয়ে দেন নীলিমা। মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেন—এত ছোট সোয়েটার। কার জন্য বুনছ নেলী ?

—মিলির জন্য।

বুকের ভিতরটা নিদারুণভাবে কেঁপে ওঠে অকস্মাৎ ! মিলি !

নীলিমা বলতে থাকে—চুরি করে মিলিকে তুমি শ্মশানের দিকে নিয়ে গেলে মনে নেই ? সে ঠিক পালিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। না-না, তোমার সামনে সে আসবে না ! যদি তুমি ওকে নিয়ে যাও আবার।

বুকের ভিতরটা যেন অদ্ভুত যন্ত্রণায় ভেঙে যেতে থাকে। কোন-ক্রমে অতিকষ্টে বলে ওঠেন—নার্স !

নার্স ছুটে এসে ওঁকে ধরে। ধরে নিয়ে যায় ঘরের ভিতরে। ডাক্তারকে ফোন করে। ডাক্তার আসে। দেখে বলে—সাবধানে থাকবেন। প্রেসারটা বেড়েছে।

এত যে কাণ্ড, নীলিমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একমনে সোয়েটার বুনতে ব্যস্ত।

দিন কেটে যায়। এ আকস্মিক অসুস্থতা একদিন কাটিয়ে ওঠেন মুখার্জি। কিন্তু নীলিমার উত্তেজনার তবু কি সমাপ্তি আছে ? সেদিন সকালে আবার তিনি চাপা চীৎকারে ফেটে পড়েন। উনি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলে ওঠেন—কী দিয়েছ তুমি আমাকে ! সব ফাঁকি ! সব তাসের ঘর ! যত ভাব-ভাবনা ভালবাসা তোমার সব সেই তার ওপরে, আমি কি বুঝি না ? সর্বনাশ হবে তোমাদের !

—শান্ত হও দেখি ?

—কেন শান্ত হব ! নীলিমার ঠোঁটের দুকস বেয়ে ফেনা ওঠে, তিনি বলতে থাকেন—মাথায় তোমার বাজ পড়বে ! আর, সেই রাক্ষুসীও কি সুখী হবে ভাব ! কখ্খনো না ! মিলিও মরবে ! তোমার বাসন্তী ! আবার লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে ! ঘুচবে ওই বিয়ে !

—বলছ কী তুমি!

নেলী সমানে বলতে থাকেন—আবার মেয়ে হয়েছে। ওই মেয়েও মরবে। যেমন আমার মিলি গেছে আমার কোল ছেড়ে, তেমনি ওর মেয়েও যাবে! বুক ভেঙে দিয়ে যাবে!

উঠে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মুখার্জি। ছি-ছি! এ কী সর্বনাশের কথা উচ্চারণ করছে নেলী! না-না, এ হতে পারে না।

ওর কাছ থেকে সরে এলেন মুখার্জি। নীলিমা চুপ করেছে, ওর গলার স্বর আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু, এ কী মানসিক অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসল হঠাৎ! ভাল আছে তো সোমার মেয়ে!

যা তিনি এতকাল করেন নি, তাই কি করবেন? ছুটে যাবেন কি একবার পাটনায়? শুধু একটিবার, একটিবারের জন্যও কি দেখে আসবেন শিশুটির মুখখানা!

ছুটে গেলেন তৎক্ষণাৎ সিনহার বাড়ি। বললেন—তোমরা দুজনে ওকে একটু দেখ। আমি আজই পাটনা রওনা হচ্ছি।

—পাটনা!

—হ্যাঁ।

সত্যিই তাই করলেন মুখার্জি। একটা ঝুমঝুমি, একটা আংটি, এবং আরও কী-কী যেন কিনে নিয়ে সত্যিই সেদিন পাটনার ট্রেনে উঠে বসলেন মুখার্জি। কিন্তু ঠিকানা? সোমার সেই চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি, ঠিকানাটা আর রাখা হয় নি। অবশ্য, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে করে কি আর খুঁজে বার করা যাবে না? বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে যখন অনুপম?

একটু ঘুরতে হল ঠিকই। দোতলা বাড়ি। তাকে দরজার গোড়ায় দেখে বোধহয় রীতিমত চমকেই উঠল অনুপম,—এ কী! বাবা! আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। আজই ফিরে যাব। বাসন্তী কই, বাসন্তী?

অনুপম নিশ্চুপে ওকে নিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। এবং

সিঁড়ি শেষ করে দোতলায় ওঠামাত্রই মুখোমুখি তার সঙ্গে দেখা। প্রথম দর্শনেই মনে হবে না, এতো খারাপ চেহারা হয়ে গেছে ওর!

কিন্তু ওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ কী শুনলেন তিনি!

থরথর করে কেঁপে উঠল হাতখানা। পড়ে গেল হাতের সব খেলনা। ঝুমঝুমিটা সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করতে করতে এক জায়গায় গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাচ্চাটা নেই। বাচ্চাটা মারা গেছে কাল। ছ মাসও পুরো বয়স হয় নি তার!

হঠাৎ-ই মনে ধ্বক করে উঠল একটা কথা। কাল সকালেই ত নীলিমা চীৎকার করে বলেছে—ওই মেয়েও মরবে। যেমন আমার মিলি গেছে আমার কোল ছেড়ে, তেমনি ওর মেয়েও যাবে! বুক ভেঙে দিয়ে যাবে!

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন মুখার্জি, কখন ও গেছে?

সোমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। উত্তর দিল অনুপম, গতকাল সকালে।

—সকালে!

—হ্যাঁ, সকালে!

আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালেন না মুখার্জি। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এলেন মুখার্জি। পিছন থেকে সোমা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, বাবা!

অনুপমও ডাকল, বাবা!

কিন্তু তিনি শুনলেন না কারুর কথা। সোমা ওর পিছনে পিছনে ছুটে এল সদর দরজার কাছে। বললে, মা এসেছে বাবা!

—মা!

অনুপম বললে, সোমার মা। বিলেত থেকে এসেছেন। এসেই একটা স্কুল গড়ে তুলেছেন ছোটদের। এখানে এসেছিলেন। কাল এলেও দেখা পেতেন তাঁর। বাচ্চাটাও গেল, তিনিও ফিরে গেলেন কলকাতায়। ঠিকানা, ২২৭নং নিউ আলিপুর রোড।

কে কাকে কার ঠিকানা বলছে! আর কিছু তাঁর শোনবার নেই, জানবারও নেই। যার কথা এখন মনে জাগছে সে নীলিমা। পাটনায় আসা যাওয়ার ব্যাপারে তাকে দেখা হয় নি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা! তার স্নান, তার খাওয়া, ঠিকমতো হয়েছে কি না কে জানে!

পরবর্তী ট্রেনেই কলকাতা। অনুপম স্টেশনে এসে নিজেই তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। পথে আসতে আসতে কী যে সব বলছিল, কিছু মনে নেই!

বেশ রাত হয়ে গেল হাওড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে।

—এই ট্যাক্সি, চল।

ট্যাক্সিটার সীটে নিজেকে যখন এলিয়ে দিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, শরীরে আর একবিন্দুও রক্ত বুঝি অবশিষ্ট নেই!

—কোনদিকে যাবেন স্যার? ট্যাক্সিচালক বুঝি বাঙালী।

—আলিপুর।

ছুটল ট্যাক্সি। যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে সমুদ্রের বুকে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলি কেটে কেটে তাঁর ছোট্ট পাইলট বোটটি এগিয়ে চলেছে। ঠিক তেমনি নীল জামা-পাজামা পরে রামলু দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে। হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথার মত একটা ভাঙা-মাস্তুল জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রে নোঙর ফেলে, তাকে বুঝি নিয়ে আসতে হবে বন্দরে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উঠলেন তিনি জাহাজে। নিয়ে আসতে লাগলেন জাহাজটাকে জেটিতে।

—পুল্ অন্ ষ্টারবোর্ড।

—শ্লাক্ ডাউন পোর্টসাইড!

—বাক্ আপ, মেঘাদ্রি!

ধীরে ধীরে জাহাজ বাঁধা পড়ল জেটিতে। দেখা গেল রিডরিগের হাসি-হাসি মুখখানা, ওয়েল ডান্ মুখার্জি!

—স্যর-স্যর?

কে যেন তাঁকে ডাকছে। রামলু নাকি? কেয়া হ্যায় রামলু?

—আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন? স্যর?

চোখ খুললেন মুখার্জি। রামলু নয়, ট্যাক্সি ড্রাইভার। আবছা ওর মুখখানা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে ভীষণ কুয়াশা জমেছে বুঝি! বললেন তাকে ঠিকানাটা। কী বললেন কে জানে। গাড়ি আবার মুখ ঘুরিয়ে ছুটে চলল।

—এসে গেছি স্যর। এবার নেমে পড়ুন।

এসে গেল? মুখ বাড়িয়ে চারিদিকে একবার মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিলেন মুখার্জি। কেমন যেন অদ্ভুত ঝাপসা দেখাচ্ছে চারিদিক! চারিদিকে কি বরফ পড়েছে, সেই গ্লাসগোর মত? না, গ্লাসগোর মত অত পুঞ্জীভূত বরফ নয়। তবে কি ল্যাম্বেথ? শীতকালের কুয়াশা-ঘেরা বিচিত্র ল্যাম্বেথ?

উঠে বসলেন। দরজাটা খুলে নামলেন নীচে। বেশ শীত শীত করছে। কিন্তু, কেমন আছে নেলী? তাকে প্রায় দুদিন না দেখতে পেয়ে কোন অস্থিরতা প্রকাশ করে নি তো সে? ওকে কে দেখছে? গৌতমও নেই। একা, একেবারেই সে একা।

কিন্তু সত্যিই কি চারিদিকে তুষার পড়েছে? এমন ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন চারিদিক! যন্ত্রচালিতের মত পকেট থেকে ব্যাগ বার করে ট্যাক্সির ভাড়াটাও দিলেন। ক শিলিং?

শিলিং তো নয়, ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার হাতে তুলে দিল কিছু খুচরো আনি-দোয়ানি-পয়সা। তবে তিনি ওর হাতে কী তুলে দিলেন? পাউণ্ডের নোট নয়? সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে মনে হচ্ছে, নেলীকে দেখতে যেতে হবে এখখুনি। আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কোথায় আমি? গ্লাসগো, না, ল্যাম্বেথ?

ট্যাক্সিটা ফিরে গেল। ওই তার পিছনে শেষ লাল বিন্দুটুকু ঘন কুয়াশার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়ালেন মুখার্জি। কিন্তু এ কী? এ কোথায় তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল ট্যাক্সি? কী একটা স্কুলের বোর্ড ঝুলছে দরজার ওপরে। কী একটা নম্বরও যেন লেখা তার পাশে, 'নিউ আলিপুর রোড।'

নিউ আলিপুর! নিউ আলিপুরে তিনি এলেন কেন? কেমন করে?

ঝাপসা ঝাপসা! সব কিছু যেন তুষারের ঝড়ে মুছে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে!

ল্যাম্বেথে বসে ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াতে পড়াতে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতবর্ষে গিয়ে ভারতবর্ষের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও পড়াতে পারতেন যদি তিনি!

সেই স্বপ্ন যেদিন সার্থক হয়ে উঠল, সেদিন ওই একটিমাত্র প্রার্থনাই মনে করেছিলেন সুজাতা, হে ঈশ্বর! ওঁদের কারুর সঙ্গে যেন কখনও দেখা না হয়!

কিন্তু, কী ভবিতব্য! মেয়ের বিয়ের খবর শুনেছিলেন মিস্টার সিদ্ধান্তের চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন. স্নেহের বোন সুজাতা, সোমা বিয়ে করেছে। এ বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। তুমি জানতে না, সে-ও জানত না আমি খৃষ্টান। আমার সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সে বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিল। আমি খৃষ্টান হয়ে তাকে উপনিষদ পড়িয়েছি, বাইবেল পড়াই নি। কারণ, সে যে হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর কন্যা, তার বিশ্বাস আমি নষ্ট করি নি। তুমি বোন নিজেও প্রাণপণে হিন্দু হয়ে ওঠবার সাধনা করেছ, সে সাধনার পথে আমি পরিপন্থী হব কেন? অবশ্য আমি নিজে হিন্দুর দেশে জন্মে খৃষ্টান কেন, সে অন্য কথা। আমি তিনপুরুষে খৃষ্টান। এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে হিন্দুতে আর খৃষ্টানে কোনও ভেদাভেদ নেই।

চিঠি পড়ে সেদিন সত্যি কথা বলতে কী, সুজাতা নিজেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তরে লিখেছিলেন, দাদার স্নেহ যে কী তা জানবার সুযোগ হয় নি, এবার হল। আপনি আমার আপন দাদা হলেন। সেই স্নেহের সুযোগেই পুনর্বার জানাচ্ছি আমার প্রার্থনা, কোনও মিশনের কাজ দিয়ে আমাকে কি ভারতবর্ষে আপনি নিয়ে যেতে পারেন না?

বলা বাহুল্য, দাদা সে ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করে দিয়েছিলেন। কোন এক মিশনের হয়ে তিনি এলেন কলকাতায়। এসে ছোটদের স্কুলও গড়ে তুললেন। তাঁর কথা কেউ জানতও না। জানতেন শুধু দাদা—মিস্টার সিদ্ধান্ত। পরে জেনেছিলেন দাদারই বন্ধু ত্রিভঙ্গী পার্কের মিস্টার বোস। মিস্টার বোসের ছেলে অভিজিতের কাছ থেকেই তিনি একদিন পান সোমার মেয়ের খবর। পেয়ে আর থাকতে পারেন নি, ছুটে চলে গিয়েছিলেন—পাটনায়।

সে শোক তবু সহ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এ কী হল আজ? আজ এ কী পরীক্ষায় তাঁকে ফেললেন ঈশ্বর? এ বাড়িতে টেলিফোন নেই, পাশের বাড়ির ভদ্রলোকদের রাত্রিবেলায় বিরক্ত করে তাড়াতাড়ি টেলিফোন করলেন তিনি অভিজিতকে।

—কে? অভিজিৎ? মিস্টার মুখার্জি হঠাৎ-ই এসে পড়েছেন। খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। নীচের দরজায় ভয়ানক শব্দ হতে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—উনি। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। কেমন করে এলেন জানি না। তুমি শীগগির এস। ওঁকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। আমি ওঁর বাড়িতে যেতে পারি না, সে তো তুমি জানই!

আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে এসে পড়ল অভিজিৎ। ততক্ষণে ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু ভয়ানক দুর্বল। বললেন—নেলী! নেলী কোথায়! কেমন আছে সে?

শিয়রের কাছে বসে—সুজাতা—সাদা শাড়ি পরা। প্রথম দেখায় অনেকটা যেন সোমার মত মনে হয়েছিল।

—এখানে আমি কেমন করে এলাম?

—কথা বল না। অভিজিৎ, একজন ডাক্তারকে খবর দেবে?

—নিশ্চয়ই। ওঁর ডাক্তারকে আমি চিনি। তাঁকে একেবারে সঙ্গে করে আমি নিয়ে আসছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভিজিৎ।

সুজাতা বললেন—ডাক্তার আসুক। একটু সুস্থ হও। তারপর বাড়ি যেও।

মুখখানা ফিরিয়ে চোখ তুলে ওঁকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলেন মুখার্জি। সুজাতা বললেন—গতকাল অভিজিৎ তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল। নীলিমা ভালই আছে। মানে, যেমন সে থাকবার তেমনিই আছে। তুমি গিয়েছিলে পাটনায়, সোমার কাছে, না ?

মুখার্জি হাত বাড়িয়ে ওঁর একটা হাত টেনে নিলেন হাতের মধ্যে। বাধা দিলেন না সুজাতা, কিন্তু প্রাণপণে দুটি চোখ বুজে রইলেন। চোখের জল যেন ছাপিয়ে না পড়ে যায় !

—সুজাতা ?

—উঁ ?

কবে তিনি এলেন কলকাতায়, কেন তিনি এলেন—এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারলেন না মুখার্জি, মনে হল, সব প্রশ্নই আজ অবান্তর। সব প্রশ্ন, সব বেদনা-বিরহকে ছাপিয়ে, যার কথা এখন মনে জাগছে—সে, সোমা। সন্তান-হারানো, ব্যথাতুরা—সোমা ! এমন করে তার কোল খালি করে তার মেয়েটি চলে গেল কেন ?

সুজাতা বললেন—তোমার সংসারের খবর নিতে গিয়ে যা শুনলাম, তাতে নিজেকেই এখন অপরাধী মনে হচ্ছে। সোমাকে আমি তোমার কাছে আসতে দিলাম কেন ? ভারতবর্ষে ?

উত্তর দিলেন না মুখার্জি।

একটু পরেই এল অভিজিৎ। এলেন ডাক্তার। পরীক্ষা করলেন। ব্লাডপ্রেসারটা ভয়ানক বেড়েছে। যথারীতি ওষুধপত্র ইত্যাদির নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। এবং বলে গেলেন—অন্ততঃ আজকের রাত্রিটা যেন ওঁকে স্থানান্তরিত না করা হয়।

তাই হল। রাত বাড়তে অভিজিতও চলে গেল। নিশুতি হয়ে গেল রাত। ঘুমের ওষুধের কল্যাণে মুখার্জিও গভীর ঘুমে মগ্ন হলেন।

শুধু ঘুম নেই সুজাতার চোখে। ওঁর শিয়রে বসে রইলেন তিনি সারারাত—একইভাবে। অত্যন্ত উদভ্রান্ত মনে হচ্ছিল তাঁকে। ভাবছিলেন—সব ধারণা যে ওলট পালট হয়ে গেল। কেন যেন তাঁর মনে হতে লাগল, সংসার করে একেবারেই সুখী হন নি মুখার্জি। সুখী হবার ভাণ করেছেন, কিন্তু সত্যিকার শান্তি আর সুখ তাঁর আসে নি। এক নিঃসঙ্গ মন চুপচাপ পড়ে আছে সংসার-কোলাহলের একপাশে, কেউ তাকে চেনে নি, কেউ তাকে জানে নি।

দুটি চোখ সুজাতার ভরে উঠল জলে। তিনি সন্তর্পণে হাতখানা রাখলেন ঘুমন্ত মুখার্জির কপালে। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন মাথায়। মনে হতে লাগল, তাঁরই বা আর কী করার আছে?

সকালবেলা। এক কাপ শুধু চা খেলেন মুখার্জি তারপরে অভিজিতের সঙ্গে গেলেন চলে। যাবার আগে শুধু একটি অনুরোধ তিনি ওঁকে করলেন—তুমিও চল না সুজাতা।

দুটি ব্যথিত চোখের দৃষ্টি ওঁর চোখের ওপর তুলে ধরে উত্তর দিলেন সুজাতা—যাওয়া কি উচিত, তুমিই বল?

—যা উচিত বা অনুচিত, তা-ই কি শুধু দেখবার?

—অনেক সময় সেটাই বড় হয়ে ওঠে।

—আজও?

—হ্যাঁ, আজও।

—কেন?

—নিজের অন্তরকে প্রশ্ন কর।

আর কোন কথা নয়, মুখার্জি ধীরে ধীরে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। মোটরে উঠে অভিজিতকে বললেন—চল।

সেই বাড়ি। সেই ওপরের বারান্দায় সাজান চেয়ারে বসে নীলিমার সোয়েটার-বোনা। ওঁকে দেখেই তিনি সেলাই রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—কোথায় ছিলে দু দিন? মিলিকে শ্মশানে দিয়ে এলে?

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটার মধ্যে যেন দপ করে জ্বলে উঠল একটা অগ্নিশিখা। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ওর কাছে। সেই মুহূর্তে উনি ভুলে গেলেন যে, নীলিমা সুস্থ নয়, নীলিমা বিকৃত-মস্তিষ্ক। প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন মুখার্জি, ঠিক বলেছ! শ্মশানেই দিয়ে এলাম তোমার মিলির মেয়েকে।

—মিলির মেয়ে! মিলির মেয়ে!—কথাটা যেন দু তিনবার অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন নীলিমা।

মুখার্জি হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—সোমার মেয়ে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম পাটনায়। কিন্তু সে নেই। মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ, মারা গেছে! তোমারই অভিশাপে সে মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেছে!

—কী বললে!

—হ্যাঁ। সেই যে বলেছিলে না? সর্বনাশ হবে! তোমার কোল খালি করে যেমন মিলি চলে গিয়েছিল, তেমনি সোমার কোল খালি করে তার মেয়েও চলে যাবে! তাই হয়েছে! তার মেয়ে চলে গেছে!

সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠস্বর কখনও ভুলবার নয়! মানুষের কণ্ঠ থেকে যে অমন প্রেতিনী-সম্ভব আর্ত-চীৎকার উঠতে পারে, তা জানা ছিল না মুখার্জির। তিনি ওর কাছে আর দাঁড়ালেন না, দু হাতে কান চেপে ধরে চলে এলেন নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি।

আয়া এল, বেয়ারা এল। বারান্দায় একটা রীতিমত ছুটোছুটি শুরু হয়েছে মনে হল। তারপরে, এক সময় ধীর পায়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল তাঁর ঘরে, তাঁর ইজিচেয়ারটার কাছে।

—সাব, মেমসাহেবের তবিয়ৎ খুব খারাপ। ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।

একেবারে নির্জীব হয়ে গেছেন যেন মুখার্জি। যেন দাঁড়াবার

উৎসাহটুকুও তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনক্রমে বল্লে উঠলেন—সিনহাসাহেবকে খবর দাও।

বেয়ারা ছুটে গেল। একটু পরেই এল সিনহা আর তার স্ত্রী। তারা যে সামনের ঘরে নীলিমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা-ও বেশ বুঝতে পারছেন মুখার্জি। তবু কোন উৎসাহ নেই।

সিনহা ঘরে এলেন এক সময়ে দ্রুতপায়ে। বললেন—মিসেসের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। আমি ডাক্তারকে ফোন করে দিয়ে এলাম। তুমি ও-ঘরে এস। একেবারেই সাড়া পাচ্ছি না।

মুখার্জি তবু উঠলেন, না, মৃদুকণ্ঠে শুধু বললেন—Let her die in peace.

বলছ কী?

মুখার্জির কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল—ঠিকই বলছি।

কী একটা সন্দেহ করে ওঁর একেবারে কাছে সরে এলেন সিনহা, ওঁর মুখের দিকে ঝুকে পড়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন—সুধীর? সুধীর? কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

দুটি দিন দুটি রোগীকে নিয়েই সবার কেটে গেল। সিনহা এবং তাঁর স্ত্রীর ছুটোছুটির বিরাম নেই। যেখানে যেখানে ফোন করবার, করলেন তাঁরা। যেখানে টেলিগ্রাম যাবার, সেখানে টেলিগ্রামও গেল।

অবশ্য, নীলিমার অবস্থাই আশঙ্কাজনক। হার্টের অবস্থা বুঝি ভাল নয়। মুখার্জি ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। একটু সুস্থ হবার পরদিনই সকালে তিনি গেলেন ধীরে ধীরে ওর ঘরে। দেখলেন ডাক্তার আর নার্স উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে ঘিরে বসে আছে। উনি চোখ বুজে পড়ে আছেন চুপচাপ। মনে হল, ডেকে ওঠেন—নেলী! কিন্তু, না—থাক।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে এলেন ঘরে। আজ বোধহয় দিতে হবে জীবনের শেষ হিসাব! কে তাঁর প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত? সুজাতা

না, নীলিমা? না না প্রয়োজনের কথাও নয়। কথা অন্য। তাঁর অন্তর কাকে চায়?

আচ্ছা, ওরা কী সোমাকে কোন সংবাদ পাঠিয়েছে? কে জানে! সে এলে বোধহয় ভাল হত। মিলি নয়, বাসন্তী নয়—সোমা। তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু মিলি যে তাকে দেখলে চীৎকার করে ওঠবে! নেলী বাঁচবে তো!—কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছুটে যেতে ইচ্ছা করল ওই ঘরে। গিয়ে ডাক্তারবাবুকে তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—নেলী বাঁচবে তো?

কে যেন ছায়ামূর্তির মত ঢুকল ঘরে এক সময়।

—কে?

মূর্ত্তিটি অগ্রসর হয়ে এল। আমি অভিজিৎ।

—কী দেখে এলে? নেলী?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অভিজিৎ বললে—এই চিঠিখানা নিন।

—চিঠি?

—হ্যাঁ।

মুখার্জি হাত বাড়িয়ে নিলেন খামখানা। ছিঁড়ে ফেললেন তাড়াতাড়ি। ছোট্ট চিঠি—অভিজিতের কাছে শুনলাম সব। নীলিমা খুবই অসুস্থ। তুমিও সুস্থ নও। আমি কী আসব?

ইতি—সুজাতা।

হাত থেকে পড়ে গেল চিঠিখানা।

অভিজিৎ বললে—কী বলব?

—কিছু না।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি। কিন্তু, দরজার কাছাকাছি হতেই—

—এ কী! কখন এলে?

সোমা নীচু হয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করল অনুপমও। প্রশ্ন করল—মা কেমন আছেন? দুজনকে দুহাতে ধরে এগিয়ে গেলেন মুখার্জি, বললেন—এস আমার সঙ্গে।

ওদের পিছন পিছন যে ছায়ামূর্তির মত অভিজিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপরে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে একা একা এগিয়ে গেল, কেউ দেখতে পেল না। সোমাও না।

নীলিমার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। ডাক্তার চলে গেছেন নার্স পাশে বসে ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল বুঝি। চোখ দুটি আগের মতই বোজা।

নার্স ইঙ্গিতে জানাল—জ্ঞান ফিরে এসেছে।

ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জি, ডাকলেন—নেলী?

চোখ খুললেন নীলিমা।

সোমা বোধহয় অতটা বুঝতে পারে নি। তাকে কেউ বাধা দেবার আগেই সে এগিয়ে গিয়ে ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডেকে উঠল—মা? আমি। তোমার মিলি।

আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মুখার্জি—এই বুঝি কোন বিপর্যয় ঘটে।

কিন্তু, না। সোমার দিকে মুখ ফেরালেন নীলিমা। অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত দুটি চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণেও অদ্ভুত হাসি। ক্ষীণ, দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন—দিদি!

মুখার্জি বলে উঠলেন কাছ থেকে—দিদি কাকে বলছ! ও সোমা।

নীলিমার দুর্বল কণ্ঠে তবুও উচ্চারিত হল—সুজাতা!

একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন মুখার্জি, তারপরে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন—সুজাতা চলে গেছে। .কিন্তু সোমা এসেছে। ও সোমা।

—সোমা!

—মা!

যেন দুটি হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিতে চাইলেন নীলিমা। সোমা আরও এগিয়ে ওঁর দুটি হাত নিয়ে গলায় পরিয়ে বললে—মাগো!

দুটি চোখ জলে ভরে গেছে নীলিমার। দুর্বল, ক্ষীণ কণ্ঠ।

তবু তিনি বলতে লাগলেন—বিশ্বাস কর, আমি তোর মেয়েকে মারি নি—আমি তোর মেয়েকে মারি নি!

দুজনের অশ্রুর মধ্য দিয়ে যেন ওরা আজ দুজনে দুজনকে ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু, তিনি? তিনি নিজে খাটের বাজু ধরে, শক্ত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রমত্ত সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গরাশি যেন এসে পড়ছে চারিদিকে উদ্বেল হয়ে! 'মেঘাদ্রী' টাগ্‌টা প্রাণপণে বুঝি একবার বাঁশী বাজাল। 'হালভাঙা পালছেঁড়া' ব্যথার মত ভাঙা-মাস্তুল জাহাজটাকে যেন তিনি ধীর গতিতে নিয়ে চলেছেন বন্দরের নিশ্চিত আশ্রয়ে। রড্‌রিগের হাসি-হাসি মুখখানা বার বার যেন তাকে বলতে লাগল—ওয়েল ডান্ পাইল্‌ট, ওয়েল ডান্!

দু চোখ ছাপিয়ে তাঁরও বুঝি জল আসতে চায়! তবু প্রাণপণে সে অশ্রু রোধ করে, মুখ তুলে, কম্পিত কণ্ঠে তিনি যেন অদৃশ্য কোন এক মহত্তম সত্ত্বার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন—ওয়েল ডান্ পাইল্‌ট, ওয়েল ডান্!